ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

আগস্ট ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তন

প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা
চরণ সিং, সি এল দধীচ এবং এস অনন্ত

ভারতের ক্ষমতায়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি
বিজয় কুমার কাউল

ভারতের আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্তি
শ্রীপদ মতিরাম

ভারতে সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তন
এন আর ভানুমূর্তি এবং বর্ষা শিবরাম

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

আগস্ট, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা — চরণ সিং, সি এল দধীচ এবং এস অনন্ত ৫
- ভারতের ক্ষমতায়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি — বিজয় কুমার কাউল ১০
- ভারতের আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্তি — শ্রীপদ মতিরাম ১৮
- ভারতে সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তন — এন আর ভানুমূর্তি এবং বর্ষা শিবরাম ২১
- ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা — সি এস সি শেখর ২৪
- কৃষিকে সার্বিক বিকাশের হাতিয়ার করে তোলা — ভুবন ভাস্কর ৩০
- ভারতের কর্মসংস্থান ও সার্বিক বিকাশ — অধ্যাপক অলখ এন শর্মা ৩৪
- সার্বিক বিকাশে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ভূমিকা — ড. পি এম ম্যাথিউ ৩৮
- আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের নয়া উদ্যোগ — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪
- সকলের ভারত — উৎপল চক্রবর্তী ৫০
- সার্বিক বিকাশে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের গুরুত্ব — তপন কুমার ভট্টাচার্য ৫৬
- তিনটি যোজনা, একই লক্ষ্য—সামাজিক সুরক্ষা — জিতেন্দর সিং ৬১

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বৈষম্য দূরীকরণ

স্বাধীনতার পর কেটে গেছে সাড়ে ছয় দশক। এই সময়কালে ভারতের বিকাশের গতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—এক অনুন্নত রাষ্ট্রের বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরের ঘটনা সত্যিই চমকপ্রদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে বহু ওঠা-নামা সত্ত্বেও গত ত্রৈমাসিকে ভারত তাঁর আর্থিক বিকাশ হার ৭.৫ শতাংশে ধরে রাখে। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি। এই প্রতিবেদন আরও বলছে যে, ২০১৫-১৬ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আনুমানিক ৭.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালে এই হার আরও বেড়ে যথাক্রমে ৭.৯ শতাংশ ও ৮ শতাংশে দাঁড়াবে। বিগত এক বছরের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে বিকাশ হারে লক্ষণীয় বৃদ্ধির ধারাটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের সূচনার সময় দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলেন যে, 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম-সহ সকলের বিকাশ'-কেই সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তার কারণ, দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে আর্থিক বিকাশের গতি ও বণ্টনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনের মানোন্নয়ন হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP)-এর মানবোন্নয়ন সূচকে ভারতের ১৩৫তম স্থান এই কথাই প্রমাণ করে। ভারতে চিরকালই আর্থিক বিকাশের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে তার সুফল আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় প্রথমবার 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' (অর্থাৎ সর্বাত্মক বা সার্বিক বিকাশ/বৃদ্ধি)-এর বিষয়টা উত্থাপন করা হয়। এই যোজনার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও সকলের জন্য সমানাধিকার। দ্বাদশ যোজনায় এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দারিদ্র দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়িয়ে তোলার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

যোজনা

যে আর্থিক বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় ও দারিদ্র দূর করে সকলের জন্য সমানাধিকার এবং শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটায়, তাকেই বলব সর্বাত্মক বা সার্বিক বিকাশ। এই প্রচেষ্টায় সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোকে মূলস্রোতে আনার উদ্দেশ্যে এবং আরও শীঘ্র তাদের আর্থিক বিকাশের সুফল ভোগ করার সুযোগ দিতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এমনই এক পদক্ষেপ হল প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা যার ফলে মাত্র দশ মাসের মধ্যেই দেশের ৯৮ শতাংশ পরিবারের ব্যাংকে অন্তত একটি করে অ্যাকাউন্ট আছে। দক্ষ কর্মীবাহিনী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য মুদ্রা ব্যাংক, সেতু, 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'-এর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন সুরক্ষা যোজনা ও অটল পেনশন যোজনার উদ্দেশ্য দেশে স্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে শহরমুখী অভিবাসন অনেকটাই কমানো গেছে। কিষাণ (কৃষক) কার্ড, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা, জাতীয় কৃষি বাজার-এর প্রধান উদ্দেশ্য দেশের বৃহৎ কৃষক-সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, যা আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ১২০ কোটি ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে বিকাশের সুফলের সুষম বণ্টন। সমাজের সর্বস্তরে ও দেশের সর্বত্র বিকাশের বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করতে পারে প্রযুক্তি। জনকল্যাণে যথাযথভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকের কাছে সুশাসন ও প্রশাসনিক পরিষেবা (এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) পৌঁছে দেওয়ার জন্য জুলাই মাসে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও উৎপাদন শিল্পের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে সামগ্রিক রূপান্তর ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন করা। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতি 'সার্বিক বিকাশ'-এর নতুন দিশায় জোরকদমে এগিয়ে চলেছে—এই উদ্দেশ্য সফল হলে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রকৃত অর্থে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।❑

প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বা ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশন ছাড়া কোনও একটি দেশের সামগ্রিক বিকাশ ঘটতে পারে না। সমাজের আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর অংশকে সহজ শর্তে বিভিন্ন আর্থিক সুযোগসুবিধা ও পরিষেবা দেওয়াই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের একেবারে গোড়ার কথা। আর এই লক্ষ্য পূরণের প্রথম ও প্রধান শর্তই হল দেশজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা তথা ব্যাংকিং পরিষেবার প্রসার যাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষকে মহাজনদের শোষণের শিকার না হতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার ফলই বা কী মিলেছে? বিশ্লেষণ করেছেন **চরণ সিং, সি এল দধীচ** *এবং* **এস অনন্ত।**

সমাজের আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর অংশকে সহজ শর্তে বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং তার মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ ও আর্থিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করাই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বা ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশন-এর মূল কথা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ দেশ জুড়ে সুষমভাবে এবং আরও উন্নততর উপায়ে সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। মহিলা-সহ দরিদ্র ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে আরও সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলে। 'সেভিংস' এবং 'পেমেন্ট' অ্যাকাউন্ট, ঋণ বিমা এবং পেনশনের মতো বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার দরজা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য খুলে দেওয়াই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্য। এর পাশাপাশি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, অবসরকালীন সঞ্চয় বা আপৎকালীন ঋণ-সহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলা সম্পর্কিত বিমাক্ষেত্রে নানা পরিষেবা দেওয়াও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। এইভাবেই বৃহত্তর দেশবাসীর উন্নততর জীবনযাত্রা ও আরও ভালো রোজগার নিশ্চিত করতেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ওপর এই গুরুত্ব।

প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা লাভের পথ সম্প্রসারিত করাটা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এই কাজেরই এক অঙ্গ। স্বাধীনতার সময় থেকে সরকার এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে নানান সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক আগের গৃহীত পদক্ষেপগুলিতে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলেনি। তবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে সীমিতভাবেও যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সফল হয় তা সম্প্রতি কয়েক মাসে নিশ্চিত করতে চেয়েছে ভারত সরকার। 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা' নামক এই প্রকল্পে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে এবং বর্তমানে দেশের ৯৮ শতাংশ পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এই ধরনের প্রকল্প দেশে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এগুলির প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি যে দেশের আর্থ-সামাজিক চালচিত্রে পরিবর্তন আনছে তাতে সন্দেহ নেই।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ইতিহাস

দেশের মানুষকে যাতে অপ্রথাগত আর্থিক ক্ষেত্রের ওপর বেশি নির্ভর করতে না হয় সে ব্যাপারে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই নীতি প্রণেতারা চিন্তা-ভাবনা করছেন। সে সময়কার বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে অন্যতম ছিল নিকলসন রিপোর্ট (১৮৯৫), যেখানে মহাজনদের রমরমা কমানোর জন্য 'জমি ব্যাংক' গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ, পাশ হয় সমবায় ঋণ সমিতি আইন, ১৯০৪। সমবায় ঋণ সমিতিগুলিকে একটি আইনি ভিত্তি দিতেই এই আইন প্রণয়ন। বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার ধারণাটা স্বাধীনতার পরেই বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে এবং 'সর্ব ভারতীয় গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা—১৯৫১-৫৪'-এর অব্যবহিত পরে তা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৯৫০-৫১ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের মোট প্রদত্ত ঋণের মাত্র ০.৯ শতাংশ দিয়েছে কৃষকদের। অন্যদিকে, কৃষিভিত্তিক মহাজনরা দিয়েছেন ২৪.৯ শতাংশ ঋণ এবং কৃষকদের মোট ঋণের ৪৪.৮ শতাংশই দিয়েছেন পেশাদার মহাজনরা (ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ২০০৮, ২০১১)। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পরিণত করা হয়। এরপর ১৯৬৯ এবং ১৯৮০ সালে দু' দফায় আরও বেশ কিছু ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হয়। স্থাপিত হয় জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট—নাবার্ড)। কৃষি-সহ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের জোগান বাড়াতে চালু হয়েছে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রমূলক ঋণ বা

প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং। প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ। ২০০৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সব ধরনের আর্থিক পরিষেবা-সহ একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে ব্যাংকগুলিকে বাহুল্যবর্জিত বা 'নো-ফ্রিলস্' (২০১২ সালে এর নতুন করে নাম দেওয়া বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট এবং বর্তমানে এর নাম জন ধন) অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হয়।

এর পর যখন রঙ্গরাজন কমিটি (ভারত সরকার, ২০০৮) দরিদ্রদের জন্য গচ্ছিত আমানত, ঋণ, ক্ষুদ্র বিমা বা অর্থ প্রেরণের মতো পরিষেবা নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত করার সুপারিশ জানাল তার পর থেকেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি আরও জোরদার হল। এর ফলস্বরূপ, ব্যাংকগুলিকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ১০০ শতাংশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য অন্ততপক্ষে একটি জেলা চিহ্নিত করার পরামর্শ দেওয়া হল। ব্যাংকগুলিকে আরও যেসব পরামর্শ দেওয়া হল সেগুলির মধ্যে রয়েছে :

(১) প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মানুষের হাতের নাগালে স্বল্প খরচে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক বিজনেস করেসপন্ডেন্ট মডেল (বিসি মডেল) চালুর উদ্যোগ নেওয়া;

(২) ২০১০ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য পর্ষদ অনুমোদিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা (এফআইপি);

(৩) ২ হাজারের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রতিটি গ্রামকে ২০১২ সাল এবং ১ হাজার থেকে ২ হাজার জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রতিটি গ্রামকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক (ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনার পথনির্দেশিকা বা রোডম্যাপ তৈরি;

(৪) অন্ততপক্ষে ৪ ধরনের ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান এবং

(৫) যে সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় কোনও ব্যাংক নেই সেই সমস্ত এলাকায় ব্যাংকগুলির নতুন শাখার অন্ততপক্ষে ২৫ শতাংশ স্থাপন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হল কিষাণ/জেনারেল ক্রেডিট কার্ড প্রদান। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের ঋণের জোগান দিতে সম্প্রতি চালু করা হয়েছে মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট রিফাইন্যান্স এজেন্সি (মুদ্রা) ব্যাংক। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পেতে পারবেন এই ব্যাংক থেকে। ২০ হাজার কোটি টাকার মূল তহবিল এবং ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ গ্যারান্টি তহবিল নিয়ে গঠিত এই ব্যাংক দেশের অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থের জোগান দিয়ে সাহায্য করবে। তবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষত দেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রথাগত ঋণের উৎসগুলির প্রসার ঘটছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সর্বভারতীয় ঋণ এবং বিনিয়োগ সমীক্ষা (অল ইন্ডিয়া ডেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভে) অনুযায়ী, যেখানে ১৭.২ শতাংশ পরিবার প্রাতিষ্ঠান সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন সেখানে অপ্রথাগত বিভিন্ন সংস্থার (নন-ইনস্টিটিউশনাল এজেন্সিজ) কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন ১৯ শতাংশ পরিবার। তাই গ্রামীণ এলাকায় ঋণদাতা হিসাবে এখনও সেই মহাজনদেরই রমরমা—প্রথাগত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেও এদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকানো যায়নি। দরিদ্র জনসাধারণের কাছে প্রথাগত ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পথে বেশ কিছু বাধার কথা উল্লেখ করেছেন অনন্ত এবং ওনকু (২০১৩)। সিং এবং নায়েকের সমীক্ষায় (২০১৫) ২০১৪ সালের গোড়ার দিকে করা গুব্বির এক সমীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ মডেলের চাহিদা ও সরবরাহজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-১
প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা

(অঙ্ক কোটিতে)

ক্রমিক নং	ব্যাংক	যত সংখ্যক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে			যত সংখ্যক 'রুপে'ডেবিট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে	অ্যাকাউন্ট-গুলিতে জমা অর্থ	শূন্য ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট শতাংশের হিসেবে
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট			
১.	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক	৬.৯	৫.৮	১২.৭	১১.৯	১৪৩৫৭.৫	৫২.৩
২.	বেসরকারি ব্যাংক	২.৫	০.৪	২.৯	২.১	৩২৫৮.৫	৫২.১
৩.	আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক	০.৪	০.৩	০.৭	০.৬	১০৬৮.৬	৪৯.৩
	মোট	৯.৭৯	৬.৫	১৬.৩	১৪.৫	১৮৬৮৪.৬	৫২.২

সূত্র : ভারত সরকার (২০১৫)

তবে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পূর্ববর্তী সমস্ত মডেলের চেয়ে স্বতন্ত্র। এটি যে শুধু একটি মিশন রূপে পরিচালিত কর্মসূচি তা নয়, বরং এই যোজনার আওতায় 'রু-পে ডেবিট কার্ড' বা 'ক্ষুদ্র বিমা'-র সুবিধা একে পূর্ববর্তী অন্য সব কর্মসূচির চেয়ে আলাদা করেছে। সেইসঙ্গে গ্রামগুলির পরিবর্তে দেশের সমস্ত পরিবারকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের আওতায় আনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচিতে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা সূচনার সময় ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারির মধ্যে ৭.৫ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তা রেকর্ড সময়ে অতিক্রম করা গেছে (সারণি-১)।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সামগ্রিক প্রভাব কিন্তু শুধু ব্যাংকিং ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তবে গত দুই দশকের অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য এক মজবুত ব্যাংকিং ক্ষেত্রের গঠন ও তার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অতীতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাত ধরেই নানা সামাজিক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত এই

পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে গ্রামীণ ভারত—সেখানে কৃষিকাজ যন্ত্রচালিত হয়েছে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি-সহ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানান পালাবদল এসেছে। ব্যাংকিং লেনদেনের মধ্যে দিয়ে এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চিত্রটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনটি সুলভ সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য একটি সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে সংস্থান জন ধন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সেটাই একে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই তিনটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প হল—প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা। এই তিনটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০.৪ কোটি মানুষকে আনা হয়েছে (ভারত সরকার, ২০১৫বি)। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অ্যাকাউন্টকে মূলকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে নাগরিকদের কাছে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিতে যেমন পরিবর্তন আনা যেতে পারে, তেমন একইসঙ্গে দরিদ্র তথা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের একটি সর্বাত্মক সামাজিক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা নিয়েছে প্রযুক্তি, বিশেষত ২০১০ সালের পর। প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে প্রযুক্তিখাতে বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানখাতে ব্যয়ভার যে ধারাবাহিক কমছে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার পক্ষে তা নিঃসন্দেহে সুখবর। জন ধন, আধার ও মোবাইল (জেএএম)-এর সঙ্গে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড ব্যবহারের জন্য যে ছাড়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে তা আমাদের সমাজের অর্থনীতির চালচিত্রটাই বদলে দিতে পারে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের প্রসারের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকার পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন তথা 'আধার' চালু করতে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তরফে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বর্তমানে এমন একটি পরিকাঠামো তৈরিরও সুযোগ করে দিয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে এক অভিনব ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়। এই অভিনব সুযোগ এর আগে কখনও আসেনি। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার কাহিনীমূলক সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, জন ধন প্রকল্প যে হারে প্রসার লাভ করছে তাতে এই কাজ খুব একটা কঠিন হবে না। কারণ, গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ পরিবারই তাদের অর্থ ২৫ বর্গকিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ব্যয় করে থাকে। আর, ভারতের অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিকটবর্তী শহরের ৫-২৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই অবস্থিত।

জন ধন অ্যাকাউন্টগুলির ব্যাপক প্রসার এমন এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে যে এই অ্যাকাউন্টগুলিকে কেন্দ্র করে এক বৃহত্তর নেটওয়ার্ক গড়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে গ্রাহকদের সংযোগ ঘটানো যায়। এই ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির অধিকাংশ ইতিমধ্যেই প্রথাগত ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করেছে। আধারভিত্তিক মাইক্রো এটিএম-গুলিতে (বিসি আউটলেট) নগদ টাকার পরিবর্তে 'রু-পে কার্ড' দিয়ে কেনাকাটার

সারণি-২
আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অগ্রগতি : ব্যাংক ও আঞ্চলিক ও গ্রামীণ ব্যাংক

বিশদ বিবরণ	২০১০ সালে শেষ হওয়া বছর	২০১১ সালে শেষ হওয়া বছর	২০১২ সালে শেষ হওয়া বছর	২০১৩ সালে শেষ হওয়া বছর	২০১৫ সালে শেষ হওয়া বছর
গ্রামগুলিতে বিভিন্ন ব্যাংকিং কেন্দ্র					
(ক) শাখা	৩৩,৩৭৮	৩৪,৮১১	৩৭,৪৭১	৪০,৮৩৭	৪৬,১২৬
(খ) শাখা ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় (ব্রাঞ্চলেস মোড)	৩৪,৩১৬	৮১,৩৯৭	১,৪৪,২৮২	২,২৭,৬১৭	৩,৩৭,৬৭৮
(গ) মোট	৬৭,৬৯৪	১,১৬,২০৮	১,৮১,৭৫৩	২,৬৮,৪৫৪	৩,৮৩,৮০৪
বিজনেস করেসপন্ডেন্ট বা বিসি মডেলের আওতায় শহরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান	৪৪৭	৩,৭৭১	৫,৮৯১	২৭,১৪৩	৬০,৭৩০
বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট শাখা					
(ক) সংখ্যা মিলিয়নে	৬০.১৯	৭৩.১৩	৮১.২০	১০০.৮০	১২৬.০০
(খ) টাকার অঙ্ক বিলিয়নে	৪৪.৩৩	৫৭.৮৯	১০৯.৮৭	১৬৪.৬৯	২৭৩.৩০
বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের সুবিধাযুক্ত বিজনেস করেসপন্ডেন্ট					
(ক) সংখ্যা মিলিয়নে	১৩.২৭	৩১.৬৩	৫৭.৩০	৮১.২৭	১১৬.৯০
(খ) টাকার অঙ্ক বিলিয়নে	১০.৬৯	১৮.২৩	১০.৫৪	১৮.২২	৩৯.০০
আমানতের অতিরিক্ত অর্থ তোলা বা ওভারড্রাফটের সুবিধাযুক্ত বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট					
(ক) সংখ্যা মিলিয়নে	০.১৮	০.৬১	২.৭১	৩.৯২	৫.৯০
(খ) টাকার অঙ্ক বিলিয়নে	০.১০	০.২৬	১.০৮	১.৫৫	১৬.০০
কিষাণ ক্রেডিট কার্ড					
(ক) সংখ্যা মিলিয়নে	২৪.৩১	২৭.১১	৩০.২৪	৩৩.৭৯	৩৯.৯০
(খ) টাকার অঙ্ক বিলিয়নে	১২৪০.১০	১৬০০.০৫	২০৬৮.৩৯	২৬২৩.০০	৩৬৮৪.৫০
জেনারেল ক্রেডিট কার্ড					
(ক) সংখ্যা মিলিয়নে	১.৪০	১.৭০	২.১১	৩.৬০	৭.৪০
(খ) টাকার অঙ্ক বিলিয়নে	৩৫.১০	৩৫.০৭	৪১.৮৪	৭৬.৩০	১০৯৬.৯০

সূত্র : ভারত সরকার (২০১৪সি), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (২০১৩, ২০১৪, ২০১৫)

খরচ মেটানো যাবে। বায়োমেট্রিক চিহ্ন দিয়ে কার্ডে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। তবে, এই ব্যবস্থা সফল করতে গেলে কিছু শর্তপূরণ আবশ্যক। সবচেয়ে বড় কথা, এর জন্য ব্যাংকগুলিকে এমন এক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রায় তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়। প্রতিটি 'রু-পে কার্ড'-এর মধ্যেই যদি 'ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস' (আইএমপিএস) রেজিস্ট্রেশন এবং নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশনস (এনএফসি) ট্যাগ থাকে তাহলে বিশেষ সমস্যা হবে না। সমাজে এই ধরনের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা গেলে নগদে কেনাকাটার আর প্রয়োজন পড়বে না—সব লেনদেন হবে বৈদ্যুতিনভাবেই। ভারতের মতো যে দেশে এখনও জনসংখ্যার একটা বড় অংশই নিরক্ষর সে দেশে প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং মোবাইল ফোনের প্রসার এক নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। অত্যাধুনিক যে সমস্ত প্রযুক্তি এখন নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে তার মধ্যে যেটির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সেটি হল আমেরিকার তরফে 'সামসাং' সংস্থাকে দেওয়া একটি পেটেন্ট—এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোনের মেমরিতে স্টোর করা একটি পরীক্ষিত আঙুলের ছাপের ছবির সঙ্গে ম্যাচ করে আঙুলের ছাপ খাঁটি বলে প্রমাণ করা যাবে।

জনসাধারণের মধ্যে বিসি মডেল দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে তাদের মধ্যে প্রথাগত আর্থিক পরিষেবাগুলির চাহিদা কতখানি। পর্যাপ্ত ব্যাংকিং পরিষেবার অভাব রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে এই ব্যবস্থার তিনটি তাৎক্ষণিক সুফল চোখে পড়েছে—লেনদেনের সুবিধা, লেনদেনের স্বল্পব্যয় এবং ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, যার ফলে ব্যাংকের তরফে প্রদত্ত ঋণের অর্থ উদ্ধারের হারও লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের প্রসারের ঠিক কতটা প্রভাব পড়েছে তার সঠিক হিসাব নির্ধারিত না হলেও এর ফলে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পরিষেবার মূল্য কমেছে। অতীতে অপ্রথাগত ক্ষেত্রের পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে এই সমস্ত পরিষেবা নিতে হত। এটিএম এবং বিসি আউটলেট ছড়িয়ে পড়ার ফলে তেলেঙ্গানার মাহাবুবনগর জেলায় অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মানি ট্রান্সফার এজেন্টরা তাঁদের ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয়েছেন। একইরকমভাবে, কোর ব্যাংকিং সলিউশনসের (সিবিএস) মাধ্যমে ব্যাংকগুলিতে তৎক্ষণাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করার ফলে গত বছর টাকা পাঠানোর (রেমিট্যান্স) ব্যয়ও অনেক কমেছে। অনেক গ্রামেই বিজনেস করেসপন্ডেরা মেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করে। তা না হলে এই অর্থ কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ বা অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বা কোনও অনিশ্চিত পিরামিড প্রকল্পে লগ্নিতে চলে যেত। প্রথাগত ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের এহেন সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ দেশে এই প্রথম। এর ফলে পরিবারগুলি তাঁদের মূল্যবান অর্থ নিশ্চিন্তে সঞ্চয় করতে পারবেন। টাকা খোয়া যাওয়ার কোনও অনিশ্চয়তা নিয়ে থাকতে হবে না। বৃহত্তর সামাজিক পরিসরেও এই ব্যবস্থার প্রভাব অপরিসীম। এখানে পরিবারগুলি তাঁদের ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা গৃহনির্মাণের জন্য ব্যয় করতে পারবেন। সন্দেহজনক পিরামিড প্রকল্প বা অপ্রথাগত ক্ষেত্রের অন্য কোনও প্রকল্পে লগ্নি করে অর্থ হারানোর চেয়ে এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

জন ধন এবং তারপর

তবে জন ধন-এর সাফল্য কিন্তু এখনও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেদিন বেসরকারি এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রের মহাজনদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে দিতে পারবে সেদিনই এই প্রকল্প সম্পূর্ণ সফল বলে দাবি করা যাবে। মূলত যাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা তাদের কাছে এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত দুটি প্রধান সমস্যা উঠে আসছে—প্রথমত, সংযোগ কেন্দ্র বা অ্যাকসেস পয়েন্টের অভাব এবং দ্বিতীয়ত বিজনেস করেসপন্ডেন্টের মাধ্যমে খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেনের সীমাবদ্ধতা (অনন্ত এবং ওনকু ২০১৪, দধীচ ২০১৪)। সংযোগ কেন্দ্রের অভাবের অর্থ এই যে দেশের অর্ধেক গ্রামেই কোনও ব্যাংকের সুবিধা নেই (সারণি-২)। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্টের ওপর থেকে সীমিত লেনদেনের নিয়ম তুলে নিলে গ্রাহকরা আরও মন মন এই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন। এই প্রকল্পের আওতাধীন অ্যাকাউন্টগুলির সীমিত নমনীয়তা এবং বিসি চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে নানান বিধিনিষেধ জন ধন-এর সাফল্য তথা এদেশের ব্যাংকিং সংস্কৃতির প্রসারকেই ব্যাহত করছে। বেশিরভাগ ব্যাংকেই একটি অ্যাকাউন্ট থেকে দৈনিক টাকা জমা দেওয়া বা তোলার সীমা মোটামুটি ১৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা। কোনও একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা হল ৫০,০০০ টাকা। এই সীমা অতিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের অনুমোদনের জন্য অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকের শাখায় বিজনেস করেসপন্ডেন্টকে যেতে হয়। দৈনিক ১০,০০০ টাকার বেশি কোনও লেনদেনে অনুমোদন দেওয়া হয় না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রাহকরা যখন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডায়রেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার—ডিবিটি) পাওয়া বা জীবন বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার অথবা সরকারের কাছ থেকে উপকারভোগী হিসাবে তাদের বিভিন্ন প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার জন্য তার জন ধন অ্যাকাউন্ট দেন এবং সেখানে দৈনিক লেনদেন ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করে যায় তখন সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

সিং (২০১৪) মনে করেন, যদি ডাকঘরগুলিকে ব্যাংকিং পরিষেবা সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ আরও সহজ হবে। দেশের ডাকঘরগুলিতে প্রায় ২৮ কোটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে যার মধ্যে ১৩ কোটিরও বেশি সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং পৌনঃপুনিক আমানত বা রেকারিং ডিপোজিট ১১ কোটির বেশি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও এই সমস্ত উদ্যোগের সম্পূর্ণ সাফল্য এখনও

মেলেনি। ন্যায্য মূল্যের যে দোকান বা ফেয়ার প্রাইস শপগুলির মাধ্যমে রেশন বিতরণ করা হয় সেগুলিকেও প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্টের বৃহত্তর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। এর ফলে এক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিপুল পরিবর্তন আনা যাবে। এ প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারে অত্যন্ত কার্যকর 'এনিহোয়ার রেশনস' উদ্যোগের (বর্তমানে রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উদ্যোগের ফলে একজন ব্যক্তি যে কোনও দোকান থেকে তাঁর রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন। সদ্য শেষ হওয়া একটি সফল পরীক্ষামূলক প্রকল্পে নাগরিকদের শহরের অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের যে কোনও 'ন্যায্য মূল্যের দোকান' থেকে রেশন সংগ্রহের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের তথ্যভাণ্ডার আধারের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে দপ্তর রেশনের চলাচলের ওপর প্রকৃত সময়ে (রিয়্যাল টাইমে) নজর রাখতে পেরেছে। সমস্ত রেশন দোকানকে (২৭,১৭৬) একটি করে বিক্রয় যন্ত্র দেওয়া হয়েছে যার সঙ্গে ২৬৭টি মণ্ডল (তহশিল) স্তরের মজুতকেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আবার একটি কেন্দ্রীয়স্থল থেকে মজুত কেন্দ্রগুলির ওপর নজরদারি চালানো হয়েছে। রেশন দোকানগুলিকে এককথায় বহুমুখী বিপণিতে পরিণত করা হয়েছে যেখানে আর্থিক পরিষেবা-সহ আরও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের প্রসারের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সফল হলে দেশ, বিশেষত দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, স্বর্ণ বন্ড প্রকল্প (গোল্ড মানিটাইজেশন স্কিম) বা 'মুদ্রা'-র মতো উদ্যোগের হাত ধরে আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হবে।

প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি) যা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হত তা এবার থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির কাছে নিয়মিত নগদের জোগান সুনিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনে তাদের কাছে বিনিয়োগের পথও খোলা রাখবে। বাজারের প্রধান চালক হয়ে উঠবে ব্যাংক, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভরগোষ্ঠী এবং মুদ্রা ব্যাংক। মূলত সহায়সম্পদ জোগানের মাধ্যম হলেও ব্যাংকগুলি এই অর্থসম্পদ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই ধরে রাখার জন্য আরও বেশি আর্থিক পরিষেবার ব্যবস্থা করবে বলে আশা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে গ্রামীণ এলাকার ১ লক্ষ ৪০ হাজার শাখা নিয়ে ছড়িয়ে থাকা ডাকঘরগুলিও এই সহায়সম্পদ ধরে রাখতে নতুন নতুন প্রকল্প চালু করতে পারে। এই জাতীয় যে সমস্ত প্রকল্পের ব্যাপারে বাজারে আগাম আভাস দেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক আমানত, ডাকঘরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, স্বর্ণ বন্ড বা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি চালু করতে পারে এমন অন্য কোনও প্রকল্প।

এই সমস্ত উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে এবং বাজারের জন্য বিভিন্ন 'ধারণা'-কে উৎপাদিত পণ্যে রূপান্তরিত করতে সহজ পুঁজির জোগান দিতেও সাহায্য করবে। সবাইকে শামিল করে ও সকলের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উচ্চহারে অর্থনীতির বিকাশ ঘটলে তবেই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র লক্ষ্য সফল হবে।❑

[চরণ সিং IIM ব্যাঙ্গালোরে অর্থনীতি বিষয়ে 'চেয়ার প্রফেসার' এবং রিসার্ভ ব্যাংকের ব্যাংকিং গবেষণা সংক্রান্ত বিভাগের প্রাক্তন নির্দেশক।
email : charansingh@iimb.ernet.in
charansingh60@gmail.com
সি এল দধীচ 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স'-এর সেক্রেটারি (অবৈতনিক) এবং রিসার্ভ ব্যাংকের গ্রামীণ অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভাগের প্রাক্তন নির্দেশক; পুণের কৃষি-ব্যাংকিং কলেজে শিক্ষকতাও করেছেন।
email : cldadhich@hotmail.com
এস অনন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় স্বাধীন গবেষক এবং IDRBT-তে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত।
email : sananth99@gmail.com]

ভারতের ক্ষমতায়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি

প্রশাসন শক্তিশালী না হলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও দুর্বল হতে বাধ্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে দেশের সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সকলকে শামিল করে বিকাশ বা ইনক্লুসিভ গ্রোথ (সার্বিক বিকাশ)-এর লক্ষ্য অধরাই রয়ে যাবে। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যথাযথ পরিচালনার অভাবে সেগুলির সুফল যদি তাদের কাছেই না পৌঁছয় তাহলে এত আয়োজনের অর্থ কী? আধুনিক প্রযুক্তিই পারে এক সুদক্ষ, কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে। আধুনিক প্রযুক্তির অঙ্গ হিসাবে বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে কী কী যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে পারে এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর এই পরিবর্তনে কীই-বা প্রভাব পড়তে পারে? বিশ্লেষণ করেছেন **বিজয় কুমার কাউল।**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে 'ডিজিটাল ভারত' সপ্তাহের সূচনা করেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি বা ডিজিটালাইজেশন আসলে মানুষ, তথা বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার মধ্যে যোগাযোগ রচনার সাম্প্রতিকতম উদ্ভাবন। তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি একত্রিত হয়েই গড়ে উঠেছে এই নতুন প্রযুক্তি। বর্তমানে চালু এই প্রযুক্তি আদতে প্রযুক্তিগত বিপ্লবেরই এক অঙ্গ। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পাঁচটি বিপ্লবের কথা জানা রয়েছে এবং বর্তমানে যে ডিজিটাল প্রযুক্তির রমরমা— প্রযুক্তির জগতে তা ষষ্ঠতম বিপ্লব। ডিজিটালাইজেশনের হাত ধরেই বিভিন্ন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। গত আড়াইশো বছর ধরে যে পাঁচটি প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটেছে ভারত তার কোনওটিতেই এখনও পর্যন্ত অংশ নিতে পারেনি। এই ধরনের সমস্ত বিপ্লবই পশ্চিমের কোনও একটি বিশেষ দেশে শুরু হয়েছে এবং পরে তা পশ্চিমেরই অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রযুক্তিক্ষেত্রের এই সমস্ত বিপ্লব থেকে পশ্চিমের দেশগুলিই মূলত বেশিরভাগ সুবিধা পেয়েছে। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও ভারত দারিদ্র, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মৌলিক আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করে চলেছে। বর্তমানে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পরিবেশ ক্ষয়ক্ষতি রোধের নয়া চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাই এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি কিন্তু দেশের এই জাতীয় নানান সমস্যা সমাধানের কাজে মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ভারতের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। যে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আলোচনা হবে সেটি এরকম "এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কি ভারতবাসীর সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনা যাবে?"

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ, সার্বিক বিকাশ এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ

দেশের সামনে এখন নানান আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস এই দেশে। এই দেশে বিপুল সংখ্যক শিশু অপুষ্টির শিকার। যক্ষ্মা, ক্যানসার বা ডায়বেটিসের মতো রোগে আক্রান্তদের কথা যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান একেবারে প্রথমের সারিতে। বিগত বছরগুলিতে দেশে সাক্ষরতার হার বাড়লেও দেশের বহু মানুষ এখনও নিরক্ষর। যুব সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের হাতে কোনও কাজ নেই। আগামী বছরগুলিতে এই বেকারত্বের সমস্যা আরও প্রকট হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ গড়ে ওঠার ফলে সমাজের প্রান্তিক অংশের দুর্দশা বেড়েছে।

সারণি-১-এ ভারতের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি তুলে ধরা হল। এই সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও সহজ-সরল রাস্তা নেই; কেননা এই সমস্যাগুলির অধিকাংশই একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন কিনা দারিদ্র, সার্বিক বিকাশ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতো বিষয়গুলি দেশের কৃষি ও সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার (অ্যাগ্রি-ইকো সিস্টেম) সঙ্গে জড়িত। এই সমস্যার সমাধানে কৃষি ও সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন। এর জন্য আবার প্রয়োজন এক সর্বাত্মক নীতিগত কাঠামো যার মাধ্যমে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একাধিক সমস্যার সমাধান করা যায়। সমস্ত অঞ্চলের জন্য আবার অভিন্ন এক সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার, একই সমাধান সূত্র সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োগ করা হলেও তা আখেরে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। আঞ্চলিক সহায়সম্পদ, স্থানীয় মানুষের প্রস্তুতি, তাদের দক্ষতা ও কাজে যোগদানের আগ্রহ, তথা আইনি

কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের দূরদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে সমাধান সূত্র রচনা করতে হবে।

গত কয়েক দশক ধরে ডিজিটালাইজেশনের আকারে যে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে তা নতুন দিশা দেখাতে পারে। শিক্ষার প্রসার, প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনা, মানুষের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ গড়ে তোলা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগের কর্মকাণ্ডে আমূল পরিবর্তন সাধন, নতুন নতুন শিল্পের বিকাশ এবং উদ্ভাবনমূলক কাজকর্মের জোয়ার আনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে তাৎপর্যপূর্ণ সুফল পাওয়া গেছে। কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্র, শিক্ষা, উৎপাদন ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ই-প্রশাসন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন যুগ থেকেই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল ভারত। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন এই দেশকে দীন-হীন করেছে। প্রযুক্তিগত কোনও বিপ্লবেই এই দেশ অংশীদার হতে পারেনি। স্বাধীনতার সময় ভারত ছিল বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সেইসঙ্গে ছিল নিরক্ষরতার অন্ধকার। আর্থ-সামাজিক সূচকগুলির অবস্থানও ছিল বড় করুণ। গত ছয় দশক ধরে দেশের মানুষের নিজস্ব শাসনের পরেও এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। চিত্র-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বেহাল দশার জন্য অনেকখানি দায়ী। তবে, উন্নত প্রশাসনই এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারে। উন্নত প্রশাসনই যথাযথ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি রচনা করতে পারে। উন্নত মানের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে পারে যেগুলি ঠিকমতো রূপায়িত হলে সার্বিক বা সামুদয়িক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। এখানে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকাও মাথায় রাখা হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এনেছে। এই সমস্ত প্রযুক্তির ফলে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প

চিত্র-১
ভারতে প্রশাসন, প্রযুক্তি ও সার্বিক বিকাশ

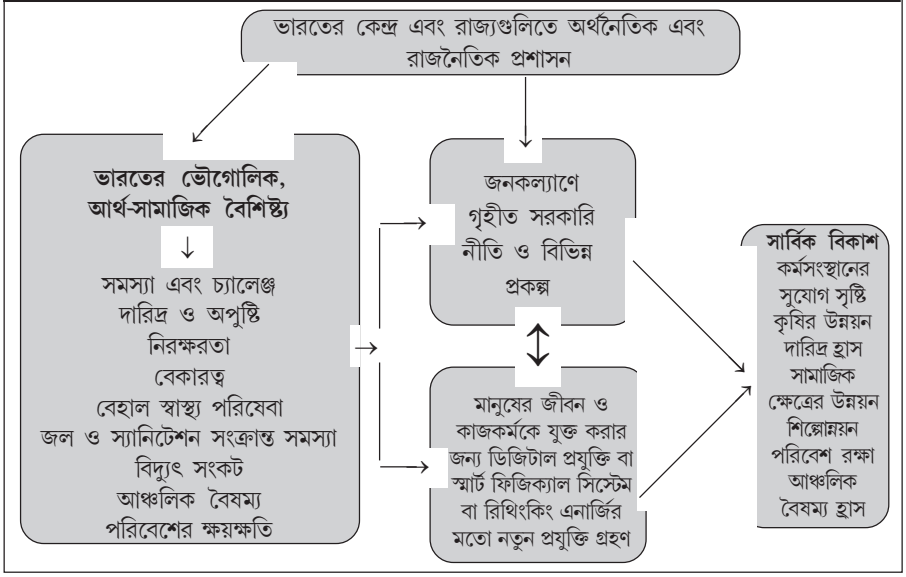

সারণি-১
প্রযুক্তি পরিবর্তন

বছর এবং মূল দেশসমূহ	প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রকৃতি ও শিল্প
১৭৭১, ইংল্যান্ড	শিল্প বিপ্লব (যন্ত্রপাতি, কারখানা এবং খাল)
১৮২৯, ব্রিটেন	বাষ্পইঞ্জিন, কয়লা, লোহা ও রেলের যুগ
১৮৭৫, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জার্মানি	ইস্পাত এবং ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ (বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, অসামরিক নৌবহর)
১৯০৮, আমেরিকা	অটোমোবাইল, তেল, পেট্রোকেমিক্যাল ও ব্যাপক হারে উৎপাদনের যুগ
১৯৭১, আমেরিকা	তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগের যুগ
২০০০	ডিজিটালাইজেশন বায়োটেক, বায়োইলেকট্রনিক্স ন্যানোটেক ও নিউমেটেরিয়ালসের যুগ

ও কর্মসূচির রূপায়ণও অনেক সহজ হয়েছে। বর্তমানে দেশের সামনে যে আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে উন্নত প্রশাসনের মাধ্যমেই একমাত্র তার সমাধান করা যেতে পারে। উন্নত প্রশাসনে অবশ্যই উপযুক্ত সরকারি নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমস্ত কর্মসূচি ও প্রকল্পের রূপায়ণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই কাজ সম্ভব হলে তবেই দেশের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে শামিল করে বিকাশ সম্ভব হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও ভারতের সার্বিক বিকাশ

গত আড়াইশো বছরে প্রযুক্তির জগতে অভাবনীয় সব পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে এই বিশ্ব। প্রযুক্তির ক্ষেত্রের ব্যাপক আকারের এই পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সাধারণত প্রযুক্তি বিপ্লব বলা হয়। এই ধরনের পাঁচটি প্রযুক্তি বিপ্লবের কথা সারণি-১-এ উল্লেখ করা হল। ষষ্ঠ বিপ্লবটি এখনও আকার নিচ্ছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই পর্বগুলি যে কোনও দেশের অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিতে পারে। এই কারণেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই পর্বগুলিকে প্রযুক্তি বিপ্লব বলা হয়।

প্রতিটি প্রযুক্তি বিপ্লবের হাত ধরে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। অর্থনৈতিক বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের বৈচিত্র, ভৌগোলিক বিস্তার এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের নিরিখে অর্ধ শতকেরও বেশি সময় লেগেছে প্রত্যেক প্রযুক্তি বিপ্লবের পূর্ণ

সুফল পেতে। পর পর প্রযুক্তি বিপ্লবের হাত ধরে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের যে জোয়ার এসেছে তাতে পুঁজিবাদের ভিত আরও শক্তপোক্ত হয়েছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষাপটে এ দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য কিছু বিশেষ ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োজন। ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ভারতের জন্য ১২টি এমন যুগান্তকারী বা ডিসরাপটিভ প্রযুক্তিকে (যে প্রযুক্তি পুরনো অচল ব্যবস্থার পরিবর্তে এক নতুন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় যেমন টাইপ রাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটারের প্রচলন) চিহ্নিত করেছে যেগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্রুত গ্রহণ করে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১] বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তথা বহু মানুষ, প্রতিষ্ঠান, পণ্য ও বাজারের ওপর এই সমস্ত প্রযুক্তির সুফল ও প্রভাব লক্ষ করা যাবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সমস্ত প্রযুক্তির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

ভারতের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ১২টি প্রযুক্তিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(১) যে প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও কাজকর্মকে 'ডিজিটাইজ' করে। (২) স্মার্ট ফিজিক্যাল সিস্টেম। (৩) শক্তিসম্পদ নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা (রিথিংকিং এনার্জি) করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি (দ্রষ্টব্য সারণি-২)।

এখানে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে চারটি প্রযুক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যথা—ডিজিটাল পেমেন্টের প্রযুক্তি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচয় যাচাই (ভেরিফায়েবল ডিজিটাল আইডেন্টিটি), ইনটেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন এবং উন্নত মানের জিআইএস। আগামী দশকগুলিতে এই চারটি প্রযুক্তিরই খুব শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এছাড়াও উন্নত রোবোটিক্স, স্বয়ংক্রিয় যান, থ্রি ডি প্রিন্টিং এবং অ্যাডভান্সড মেটেরিয়ালসের মতো প্রযুক্তিও ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ক্ষমতায়নের পক্ষে উপযোগী এই ১২টি প্রযুক্তি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করবে তার জেরে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত দ্রুত আর্থিক বিকাশ, বিকাশ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষকে শামিল

সারণি-২
ভারতের ক্ষমতায়নের পক্ষে উপযোগী ১২টি প্রযুক্তি

মানুষের জীবন ও কাজকর্মকে ডিজিটাইজ করার প্রযুক্তি	মোবাইল ইন্টারনেট	সস্তা, অত্যন্ত উন্নত এবং ইন্টারনেট সংযোগবিশিষ্ট এই মোবাইল যন্ত্র যে কোনও স্থানে ব্যক্তি এবং সংস্থার কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেয়।
	ক্লাউড টেকনোলজি	অনেক স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট বা কোনও নেটওয়ার্ক জুড়ে কম্পিউটিং ক্যাপাসিটি, স্টোরেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবা প্রদান।
	জ্ঞানভিত্তিক কাজকে স্বয়ংক্রিয় করা (অটোমেশন অব নলেজ ওয়ার্ক)	ল্যাঙ্গোয়েজ ইন্টারপ্রিটেশন (ভাষান্তর) এবং বিচারভিত্তিক কাজের উপযোগী এবং আনস্ট্রাকচারড অ্যানালিসিসের জন্য ইনটেলিজেন্ট সফটওয়্যার যাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত হয়।
	ডিজিটাল পেমেন্ট	ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং নির্ভরযোগ্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম ব্যাংকিং পরিষেবা আওতার বাইরে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নগদে লেনদেনের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দেবে।
	ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচয় যাচাই (ভেরিফায়েবল ডিজিটাল আইডেন্টিটি)	বিভিন্ন সহজ-সরল পদ্ধতিতে ডিজিটাল পরিচয় যাচাই করা যেতে পারে। এর ফলে নিরাপদে অর্থ প্রেরণ এবং সরকারি পরিষেবার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া অনেক সহজ হবে।
স্মার্ট ফিজিক্যাল সিস্টেম	ইন্টারনেট অব থিংগস	যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সরঞ্জাম চালনার জন্য ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত ডাটা ও তার বিশ্লেষণ ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যের সেনসর ও অ্যাকচুয়েটরের নেটওয়ার্ক।
	ইনটেলিজেন্ট পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থা	পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে ইন্টারনেট অব থিংগসের সঙ্গে ডিজিটাল পরিষেবার ব্যবহার।
	অত্যাধুনিক জিওগ্রাফিক ইনফর্মেশন সিস্টেম (জিআইএস)	এক বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে সহায়সম্পদ ও ব্যবহারিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্থান সম্পর্কিত তথ্যকে আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা।
	পরবর্তী প্রজন্মের জিনোমিক্স	কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দেশের শক্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দ্রুত ও সস্তার জিন সিকোয়েন্সিং ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক জেনেটিক প্রযুক্তি।
শক্তিসম্পদ নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি (রিথিংকিং এনার্জি)	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি	যে প্রযুক্তি অচিরাচরিত তেল ও গ্যাসের (সাধারণত শেল থেকে, উত্তোলনকে ব্যয় সাশ্রয় করে ভারতের শক্তি নিরাপত্তাকে মজবুত করার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।
	পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি	পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি কমানো তথা গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত এমন প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পুনর্নবীকরণ-যোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
	অত্যাধুনিক শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তি	শক্তি সঞ্চয়ের সরঞ্জাম বা ব্যবস্থাপনা, উন্নত পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুতের বহির্গমন, সরবরাহের ক্ষেত্রে হেরফের, তথা বিতরণের সময় বিদ্যুতের অপচয় হ্রাস।

সূত্র : নসির কাকা ও অন্যান্য, ইন্ডিয়াজ টেকনোলজি অপরচুনিটি : ট্রান্সফর্মিং ওয়ার্ক, এমপাওয়ারিং পিপল, ম্যাকিনসে কোয়ার্টার্লি, ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ডিসেম্বর, ২০১৪।

করা এবং উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম'-এর কথা বলে আমরা আলোচনা শুরু করব। এরপর, ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান পাঁচটি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবের ওপর আলোকপাত করব।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'—প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর এক অভিনব উদ্যোগ

বর্তমানে দেশ যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেগুলি অতিক্রম করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই ভারত সরকারের তরফে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সূচনা। এই কর্মসূচিতে এমন এক 'ডিজিটাল ভারতের' পরিকল্পনা করা হয়েছে যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মানুষ এই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অনন্ত সম্ভাবনার শরিক হতে পারবে। ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে যে জাতীয় সড়কের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁদের লক্ষ্য পরিষ্কার—উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান, বিভিন্ন উদ্ভাবনে উৎসাহ দান, আরও বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। আর এই সমস্ত লক্ষ্যপূরণে তাঁদের হাতিয়ার হবে প্রযুক্তি এবং তাঁরা এও জানেন যে, সমগ্র ভারতব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমেই 'ডিজিটাল' ভারতের ভিত্তি রচনা করতে হবে।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক নাগরিককে পরিষেবা হিসাবে ডিজিটাল পরিকাঠামোর সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি চাহিদা মতো তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এককথায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন ঘটছে। এই প্রকল্পের আওতায় নয়টি স্তম্ভকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের তরফে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে গড়ে তোলার ওপর যার মাধ্যমে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করা যাবে। এছাড়াও, নতুন গ্রামগুলিতে পূর্ব নির্দেশিত যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে শহরাঞ্চলেও ব্রডব্যান্ডের প্রসার বাড়ানোর ওপরেও আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ব্রডব্যান্ডের প্রসার ঘটলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। সকলের কাছে মোবাইল সংযোগ পৌঁছে দিতে সরকার দৃঢ় সংকল্প। ২০১৮ সালের মধ্যে ৪০ হাজারেরও বেশি গ্রাম মোবাইল প্রযুক্তির আওতায় চলে আসবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিজিটালাইজেশন আসলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উদ্ভাবনের এক জোয়ার যাকে উনিশ শতকের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। প্রযুক্তির উন্নয়ন হয় ধাপে ধাপে, বিবর্তনের পথ ধরে, কিন্তু এর ফলে সমাজে যে পরিবর্তন হয় তার প্রভাব হয় যুগান্তকারী।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

ভারতীয় অর্থনীতির কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। ভারতের দারিদ্র, সার্বিক বিকাশ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখতে গেলে এ দেশের কৃষি ও সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাকে (অ্যাগ্রো-ইকোসিস্টেম) ভালোভাবে বোঝাটা অত্যন্ত জরুরি। কোনও একটি মডেল দিয়ে যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তা সবার আগে বুঝতে হবে। কোনও একটি অঞ্চলে যে সহায় সম্পদ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই ওই অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র মোচন, তাদের জন্য ভদ্রস্থ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা তথা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন ধরনের মডেল তৈরি করতে হবে। ১৯৫০ সাল থেকে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের চিত্রটা কিন্তু মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত হারে এ দেশ খাদ্য উৎপাদন করেছে। সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব ও নীল বিপ্লবের ফলে সামগ্রিকভাবে এ দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারত তার খাদ্যশস্য উৎপাদন পাঁচগুণ ও দুগ্ধ উৎপাদন সাত গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে কৃষকদের আত্মহত্যা ও তাদের ওপর আর্থিক শোষণের খবরও আমরা শুনি প্রতিনিয়ত। সরকারি নীতির বিচ্ছিন্নতাকেই বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যার জন্য মূলত দায়ী করেছেন। অতীতে ভারতের কৃষি নীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে মূলত খাদ্যশস্যে উৎপাদনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।[২] কিন্তু উচ্চ মূল্যবিশিষ্ট কৃষিজ পণ্যের দাম যে ক্রমাগত বেড়ে গেছে তার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সাধারণ মানুষও পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায়নি। শস্য পচনশীল না হলেও, উচ্চ মূল্যবিশিষ্ট কৃষিজ পণ্যগুলি পচনশীল এবং এগুলিকে অতি দ্রুত ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করা প্রয়োজন। কৃষকের খেত থেকে শুরু করে দালালদের হাত ঘুরে গুদাম, সেখান থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পোদ্যোগী, খুচরো বিক্রেতা এবং সবশেষে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত যে এক সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল সেটির কথা মাথায় রেখে একটি যথাযথ নীতি রচনা করা প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য অর্থসংস্থানকারী ও ব্যবসায়ীরা অংশীদার হিসাবে এই সরবরাহ শৃঙ্খলটিকে এক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার রূপ দেন। এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বা ইকোসিস্টেমকে টিকিয়ে রাখতে প্রত্যেক অংশীদারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং অবদান রয়েছে। কৃষির এই সরবরাহ শৃঙ্খলটিকে আরও কার্যকরী ও প্রতিযোগিতা-মুখী করে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তি একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে।

ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের হিসেব মতো সংকর এবং জিনগতভাবে পরিবর্তিত প্রজাতির (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড) শস্যের চাষ, সেনসর এবং ব্যবহার করে এবং জিআইএস থেকে প্রাপ্ত মৃত্তিকা, আবহাওয়া, জলের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর 'প্রিসিশন ফার্মিং' ব্যবস্থা, মোবাইল ইন্টারনেটভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ ও বাজার তথ্য পরিষেবা চালু করা গেলে ২০২৫ সালে কৃষিক্ষেত্রে যে বার্ষিক অতিরিক্ত ৮০০০ কোটি ডলার অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করার লক্ষ্য রয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ৪৫০০ কোটি ডলার আসবে

এই পথেই। এছাড়া সঞ্চয় ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ফসল সংগ্রহপরবর্তী পর্যায়ে অপচয় কমবে। গণবণ্টন ব্যবস্থায় সংস্কার ঘটলে ফসলের নয়ছয় কমবে। এইভাবেই ২০২৫ সালে বার্ষিক ৩২ লক্ষ ডলার সঞ্চয় করা যাবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অন্তত ১ কোটি কৃষকের উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ৩ থেকে ৪ কোটি উপভোক্তাকে আরও ভালো পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যাবে।

কৃষকদের শস্যবিমার ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। সব ঋতুর উপযোগী কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন, ফসল কাটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে উপগ্রহ/ড্রোন থেকে পাওয়া ছবির বিশ্লেষণ ও মোবাইল মারফত তথ্য হস্তান্তর পুরো প্রক্রিয়াকেই অনেক বিজ্ঞানসম্মত করে তুলবে। এতে বিমার ক্ষেত্রে দুর্নীতির সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।[৩]

একগুচ্ছ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের ক্ষমতায়নেরও লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে। উন্নত প্রশাসন, জমির নথি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি জনসংখ্যার একটি বড় অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি নথির ডিজিটালাইজেশনে সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। এর ফলে নতুন শিল্পোদ্যোগীদের সামনের সম্ভাবনার অনেক পথ যেমন খুলে যাবে তেমনই চালু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ বাজারে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অভূতপূর্ব সুযোগ পাবে।

সামগ্রিক উৎপাদন শিল্প ব্যবস্থা

অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে যোগ দেবে। এর ফলে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র এবং এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন সরবরাহকারী, অর্থ সংস্থানকারী এবং উপভোক্তাদের নিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার যে বিশ্বজনীন মডেল আগে ছিল তা বদলে এখন হয়েছে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বা 'ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম'। ডিজিটালাইজেশনের হাত ধরে এসেছে এই রূপান্তর পর্ব। দেশের যুবসম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে তথা প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে ভারতীয় সংস্থাগুলিকে এবং নীতি নির্ধারকদের এই বিষয়টি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে আধুনিক প্রযুক্তি এবং দেখা গেছে যে ভারতীয় সংস্থাগুলি খুব দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করছে।

বর্তমানের পরিবর্তিত ডিজিটালাইজড বাণিজ্যিক পরিবেশে সংস্থাগুলিকে কাজকর্মের ধরনে পরিবর্তন আনতেই হবে। প্রত্যেক শিল্পেই 'মূল্য শৃঙ্খল' বা ভ্যালু চেন ভেঙে সংযোজন করা হচ্ছে। কখনও বা নতুন করে উদ্ভাবনও করা হচ্ছে। আবার চালু 'মূল্য শৃঙ্খল' বা ভ্যালু চেন ভেঙে নতুন উৎস ব্যবহার করে 'মূল্য' সৃষ্টি করা হচ্ছে। কখনও বা 'মূল্যের' অন্যান্য উৎস ব্যবহার করে অথবা অন্যান্য শিল্পের 'মূল্য শৃঙ্খল'-কে সংযোজিত করে সম্পূর্ণ নতুন মূল্য শৃঙ্খল সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতিতে সামগ্রিক উৎপাদন শিল্প ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে তুলে ধরা উচিত যাতে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং আমাদের উৎপাদন ক্ষেত্র বিশ্বের বাজারে আরও প্রতিযোগিতামুখী হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যোগসূত্র রচনার ওপরও সমান নজর দিতে হবে। সামগ্রিক উৎপাদন শিল্প ব্যবস্থাপনা বা 'ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম'-এর ধারণাকে তুলে ধরা গেলে এই যোগসূত্র রচনা বা সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ খোঁজা যাবে। সেইসঙ্গে অর্থ, কাঁচামাল, জমি এবং ব্যবহারকারী ও বাজারের মধ্যে যোগাযোগসাধনের মতো সমস্যাগুলিরও আশু সমাধান প্রয়োজন।

অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) চালুর প্রস্তাব রয়েছে তা দেশের বাণিজ্য ও কর্পোরেট ক্ষেত্রকে আরও চাঙ্গা ও প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এছাড়াও 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম উৎপাদনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের সরঞ্জামের আমদানি শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। দেশের উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে এ দেশকে একটি 'উৎপাদন কেন্দ্র' বা 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব'-এ পরিণত করার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ছোট শহর ও গ্রামগুলিতে নাগরিকদের তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে আগামী পাঁচ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজের জন্য কর্মীবাহিনী তৈরি রাখার ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবে সরকার।

শিক্ষা ও দক্ষতা সৃষ্টি

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা ও পঠন-পাঠনের মান নিয়ে অনেকদিন ধরেই একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অত্যন্ত করুণ। ডিগ্রির বিচারে অনেক শিক্ষাগতযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে নিয়োগের উপযোগী দক্ষতা থাকে না কর্মীদের। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেও অভাব থেকে যায়। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে ডিজিটালাইজেশন। নতুন নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি নতুন ধরনের 'অ্যাডাপটিভ অ্যান্ড পিয়ার লার্নিং'-এর সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্রযুক্তির হাত ধরে প্রশিক্ষক ও মেন্টরদের কাছে পৌঁছনো তো অনেক সহজ হয়েছেই, সেইসঙ্গে প্রকৃত সময় বা রিয়্যাল টাইমে তথ্যের আদান-প্রদানও সম্ভবপর হয়েছে। সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি দেশজুড়ে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এই পরিবর্তন সাধনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। যথাযথ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভবপর হলে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের উন্নতি, শিক্ষক ও মেন্টরদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে এই নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে আমাদের এই বিস্তৃত ও জটিল বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক এই প্রযুক্তিকে

সুসংহতভাবে কাজে লাগাতে গেলে একটি সুসমন্বিত এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক প্রচেষ্টা দরকার। এই প্রচেষ্টার তিনটি স্তম্ভ থাকবে[৪], যথা, প্রথমত, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য পঠন-পাঠনের সামগ্রী তৈরি যেমন ডিজিটাইজড পাঠ্যপুস্তক, অ্যানিমেশন বা ভিডিও-র মতো ই-কনটেন্ট তৈরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের কাছে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষালাভের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে করে তুলেছে অনেক আদান-প্রদানমূলক আনন্দদায়ক। এখানে শিক্ষালাভের পর অনুশীলনেরও অনেক সুযোগ থাকে। ভারতে খান অ্যাকাডেমি এবং মাইন্ডস পার্ক প্ল্যাটফর্ম এই ধরনের উদ্যোগের অন্যতম সফল উদাহরণ। ভারতে ভাষার তথা বিভিন্ন রাজ্যের পাঠ্যসূচির বৈচিত্রের কথা মাথায় রেখেও পঠন-পাঠন সামগ্রী তৈরি করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ। প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষকদের শিক্ষার নতুন মডেল তৈরি করা যেতে পারে। এই মডেলে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকবে। এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষকরা দূরবর্তী কোনও স্থানে থাকা সমকক্ষ অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন বা কোনও বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। গুজরাট, উত্তরাখণ্ড ও মহারাষ্ট্রের মতো বিশেষ কিছু রাজ্যে পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞান ও মত বিনিময়ের জন্য 'হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ'-এর মতো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। কর্ণাটকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা 'এডুকেশনাল রিসোর্সেস প্ল্যাটফর্ম'-এর সাহায্যে ডিজিটাল পঠন-পাঠন সামগ্রী তৈরি করছেন। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষামূলক ভিডিও, অনলাইন প্রশিক্ষণ বা বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য করার (পিয়ার সাপোর্ট) আরও অনেক মডেল রয়েছে। এমওওসি বা ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সের সঙ্গে মিশ্র শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চমানের পাঠ্যক্রমের সুযোগ এনে দিতে পারে এবং সেইসঙ্গে লার্নিং সিম্যুলেশন পদ্ধতি নার্সিং ও অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীদের একরকম হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে পারে।

তৃতীয়ত, মজবুত প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার। বর্তমানে উন্নত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের তথ্য নথিভুক্তকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সময়মতো তা খুঁজে বের করা ও সেই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে এবং এ তথ্য প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক লক্ষ্য ও শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের কাজে ব্যবহারও করতে পারে। কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও ওড়িশার মতো রাজ্য এই ব্যবস্থা রূপায়ণের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

আন্তর্জাতিক মানের বিচারে ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে যত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের প্রয়োজন এখানে রয়েছে মাত্র তার অর্ধেক। এমনকী চিকিৎসা সংক্রান্ত যেটুকু সুযোগ-সুবিধা এখানে রয়েছে তারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না। ডিসরাপটিভ টেকনোলজি বা যুগান্তকারী বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে যেমন মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ রুগির নাগালে পৌঁছে দিয়ে, মোটামুটি দক্ষতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য কর্মীদের দিয়ে বিভিন্ন ডিজিটাল সামগ্রীর মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত মৌলিক কাজকর্মগুলি সম্পন্ন করিয়ে এবং স্মার্টফোনের সঙ্গে কাজ করতে পারে স্বল্পমূল্যের এমন রোগ নির্ণয়ের এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা খোলনলচে বদলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, স্মার্টফোনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বল্প খরচেই এই পরীক্ষা করা যাবে। স্মার্টফোনের 'নেত্রজি' নামক একটি অপটিক যন্ত্র যুক্ত করে এবং এর সঙ্গে একটি সফটওয়্যারও মূল অপটিক টেকনোলজি ব্যবহার করে চোখের রিফ্র্যাকটিভ এররের মাত্রা জানা যেতে পারে। এই পরীক্ষার খরচ মাত্র ৩০০ টাকা। যে সমস্ত রুগির চশমা ছাড়াও চোখের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে এই তথ্য দূরবর্তী স্থানে থাকা চিকিৎসকের কাছে 'রিয়্যাল টাইমেই' পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সমাজ এক নেটওয়ার্কে বাঁধা পড়লে তবেই এই কাজ সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, এর মানোন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি এর গুণগত মান ও নিরাপত্তার মানের মাত্রা নির্ধারণের কাজ সহজ করাই ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্য।

ই-প্রশাসন বা ই-গভর্ন্যান্স

ভারতকে একটি 'ডিজিটালভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজে' রূপান্তরিত করা এবং একে 'জ্ঞানভিত্তিক ভবিষ্যতের' জন্য প্রস্তুত করার 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচির ঘোষিত লক্ষ্য। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে এককথায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ই-প্রশাসন ও যোগাযোগ রচনার পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সমষ্টি বলা যেতে পারে। যেমন, অপটিক ফাইবার ব্যবহার করে আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করার যে গ্রামীণ ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ প্রকল্প বিএসএনএল হাতে নিয়েছিল তাকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র আওতায় এনে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত নেট'। ই-প্রশাসন বা সাধারণ নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্যই হল লাল ফিতের ফাঁস কাটিয়ে সরকার ও নাগরিকদের সরাসরি যোগাযোগ রচনা যাতে মধ্যস্বত্বভোগীর দাপট কমে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং জঘন্য উৎকোচ প্রথার অবসান ঘটে।

নয়া দিল্লিতে ১৯৮৬ সালে প্রথম কম্পিউটারচালিত রেলের আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এ দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে পরিকল্পিত ও রূপায়িত এই প্রকল্প গণপরিষেবা প্রদানে কাজে বিলম্ব, দুর্নীতি ও অদক্ষতা কমানোর ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি যে কতটা কার্যকর হতে পারে তা প্রমাণ করেছিল। কর্ণাটকে 'ভূমি' প্রকল্পের আওতায় জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নথির কম্পিউটারাইজেশন সফল ই-প্রশাসন কর্মসূচির আরেক উদাহরণ। ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল প্রযুক্তি আসার পর এই সমস্ত প্রকল্প আরও বিস্তৃত হয় এবং

অন্যান্য রাজ্যের কাছে বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে ই-প্রশাসনের মডেল হয়ে ওঠে।[৫]

অন্যান্য দেশের মতো ভারতকেও তার সরকারকে দক্ষ এবং নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী করে তুলতে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমাদের হিসাব মতো মৌলিক পরিষেবাখাতে সরকার যা খরচ করে তার অন্তত ৫০ শতাংশই কিন্তু জনসাধারণের কাজে লাগে না। সেইসঙ্গে জটিল সরকারি প্রক্রিয়া বিনিয়োগ ও বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনমূলক বিভিন্ন পরিষেবার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বের বাজারে এই দেশকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলবে এবং সেইসঙ্গে বাণিজ্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

পরিশেষে

ভারতের সার্বিক বিকাশে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করাই ছিল এই নিবন্ধের লক্ষ্য। এই নিবন্ধে আমি ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণের পাশাপাশি 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কৃষি, উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সরকারি পরিষেবা—এই পাঁচটি ক্ষেত্রে নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যে এই ক্ষেত্রগুলির চেহারাই বদলে দিতে পারে সে কথা পরিষ্কার। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাও দূর করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের খোলনলচে বদলে জীবিকা তথা গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে। এই প্রযুক্তির হাত ধরে উৎপাদন ক্ষেত্র আরও প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে এবং এই ক্ষেত্রে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগতমান ও পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যাবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে। সরকারি পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা ও উন্নতি ঘটানো যাবে। এককথায় বলতে গেলে স্থিতিশীল প্রশাসন, সকলের জন্য সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও নাগরিক পরিষেবাগুলিকে বজায় রেখে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সামুদয়িক বিকাশের লক্ষ্যপূরণে একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে প্রযুক্তি।

তবে আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রযুক্তি গ্রহণের পথে সম্ভাব্য বাধাগুলিকে দূর করতে হবে। সেইসঙ্গে, ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃত প্রযুক্তির কুপ্রভাবগুলির ওপর নজরদারি চালানো ও সেগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত নীতি রচনা, বিধিনিষেধ তৈরি ও মান নির্ধারণ প্রয়োজন। এছাড়াও উদ্ভাবনের জন্য একটি প্রাণবন্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বহু ভাষাভাষী মানুষের এই দেশে তথ্য, জ্ঞান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রসারে একটি বহুভাষিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার। এছাড়াও দক্ষ গণবণ্টন ব্যবস্থা গঠনের কাজ হোক বা স্বয়ংক্রিয় কাজকর্ম; শহর বা গ্রামাঞ্চলের বসবাসের পরিবেশের রূপান্তর সাধনের কাজই হোক বা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান—আধুনিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথাগত ব্যবস্থাপনার কিছু কিছু বিষয়কে যুক্ত করা দরকার। তাতে প্রশাসনের বিভিন্ন কাজ অনেক সহজ হবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমের দেশগুলিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কর্ম দক্ষতা উৎপাদনশীলতা বাড়লেও মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। কিন্তু ভারতে মাঝারি মেয়াদে আরও বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেই আশা করা যায়। এই বিষয়টির ওপর কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।❑

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
email : kaulvijay@yahoo.com]

উল্লেখপঞ্জি :

(১) নসির কাকা ও অন্যান্য, ইন্ডিয়াস টেকনোলজি অপরচুনিটি : ট্রান্সফর্মিং ওয়ার্ক, এম্পাওয়ারিং পিপল, ম্যাকিনসে কোয়ার্টার্লি, ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, ডিসেম্বর, ২০১৪।

(২) অশোক গুলাটি, রিভ্যাম্পিং এগ্রিকালচার অ্যান্ড পিডিএস, মিন্ট, এপ্রিল ৩০, ২০১৪, www.livemint.com

(৩) অশোক গুলাটি এবং প্রেরণা তেরওয়ে, টেক দ্যা ফার্ম ইনস্যুরেন্স রুট, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, জুলাই ৬, ২০১৫।

(৪) ধবন, আশিস এবং নমিতা ডালমিয়া, দ্য ডিজিটাল ইন্ডিয়া পুশ ফর এডুকেশন, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, জুলাই ৮, ২০১৫।

(৫) দীনেশ মি শর্মা, ইন দ্য ক্লাউডস, ডেকান হেরাল্ড, জুলাই ৬, ২০১৫।

‘ইন্টারভিউ হল লুডোর ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু —তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।’

WBCS-2014: Gr. A/B/C/D INTERVIEW

প্রিলি, মেনসের বাধা অতিক্রম করে আজ আপনারা সাফল্যের চৌকাঠে দণ্ডায়মান। আর একটি বাধা অতিক্রম করতে পারলেই সার্থক হবে নিজের স্বপ্ন। এটিকে ‘বাধা’ বলা যায় না, বরং ‘সুযোগ’ বলা যেতে পারে। ডব্লুবিসিএস-এ ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ জীবনে বার বার আসবে না। আর তা কাম্যও নয়। সুতরাং এ সুযোগ অপচয় না করে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা একান্ত জরুরি। আপনার সচেতনতা ও বিচক্ষণতা এবং আমাদের গাইডেন্স আপনার বহুকাঙ্খিত স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে যা আপনার কাছে সহজলভ্য

- ☑ WBCS-2011, 2012, 2013-তে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন 1500+ প্রশ্ন
- ☑ IAS-টপারদের ইন্টারভিউয়ের **‘সাকসেস ফান্ডা’**
- ☑ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সংকলন-সহ কমপ্লিট স্টাডি কিট
- ☑ ইন্টারভিউট সম্পর্কে WBCS টপারদের অভিজ্ঞ মতামত
- ☑ CTO, DSPকে প্রথম চয়েস দেওয়ার সপক্ষে অকাট্য যুক্তি
- ☑ ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতা দূরীকরণের উপায়
- ☑ WBCS টপারদের সামনে মক ইন্টারভিউ এবং তার ভিডিও অ্যানালিসিস

আকাশছোঁয়া সাফল্যের অংশীদার হতে পারো তোমরাও!

২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২-এর পর ডব্লুবিসিএস-২০১৩। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর আবার অবিশ্বাস্য রেজাল্ট। পরপর পাঁচ বছর সংবাদের শিরোনামে এই প্রতিষ্ঠান। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের নিরিখে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখন এক নম্বর। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আজ যে উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে তার ধারেকাছে নেই আর কোনও কোচিং সেন্টার। এখান থেকে ডব্লুবিসিএস-২০১৩-তে ‘এ’-গ্রুপে সফল ২৬ জন, ‘বি’-গ্রুপে ৯ জন, ‘সি’-গ্রুপে ৬৫ জন এবং ‘ডি’-গ্রুপে ১৮ জন অর্থাৎ মোট ১১৮ জন চূড়ান্ত সফল। আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ পিছু সাফল্যের হার যখন একজনেরও কম তখন এখানকার একটি ব্রাঞ্চের সাফল্যের সংখ্যা ১১৮। সত্যিই অকল্পনীয় পারফরমেন্স।

প্রিলিতে হয়তো অনেকেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। তাদের এখন করতে হবে আত্মসমীক্ষা। ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণগুলিকে খুঁজে বার করে সর্বাগ্রে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা ছকে নেওয়া দরকার। যারা এক বা একাধিকবার প্রিলি দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। কিংবা যারা ২০১৬-এ প্রথম ডব্লুবিসিএসে বসতে চলেছে তাদের পক্ষেও অসম্ভব, এদের জন্য দরকার দক্ষ এবং অভিজ্ঞ গাইডেন্সের। তুমি ও গাইড—উভয়েরই ফোকাসের কেন্দ্রবিন্দু হবে Pure WBCS, nothing else. ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা পরিচালতি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে ডব্লুবিসিএস-এর ব্যাপারে শেষ কথা বলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানকার চোখ ধাঁধানো সাফল্যই বার-বার প্রমাণ করেছে। সদ্য পাশ করা ডব্লুবিসিএস অফিসারদের মহামূল্যবান পরামর্শ ও নোট্স অ্যাকসেস করা যায় একমাত্র এখানেই।

ডব্লুবিসিএস-২০১৬কে স্বপ্নপূরণের টার্গেট করতে চাইলে এখনই শুরু করা দরকার ‘শুরুর মতো শুরু’। বাড়িতে খাপছাড়া প্রস্তুতি নয়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এক্সপার্ট গাইডেন্সের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকুক প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ।

WBCS-2016-এর নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। এখানে পাবেন WBCS টপারদের টিপস এবং বিশেষ স্ট্র্যাটেজিক ক্লাশ।

কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র কোর্স ফি প্রদান করা নয়, নিজের ভবিষ্যতটাকেও তাদের হাতে সমর্পণ করা। তাই কোথাও ভর্তির আগে দশবার ভাববেন। একটা ভুল সিদ্ধান্ত আপনার কেরিয়ারকে বরবাদ করে দিতে পারে।

মেনস ক্লাব

যারা কোনও কারণে ক্লাশরুম গাইডেন্স বা পোস্টাল কোর্স করতে পারছেন না, তাদের জন্য রয়েছে মেনস ক্লাব। যারা এবার মেনস দিচ্ছেন, তারা মাত্র ৪০০ টাকার বিনিময়ে নিতে পারেন মেনস ক্লাবের সদস্যপদ। সদস্যরা পাবেন নির্বাচিত কিছু ক্লাশ করার ও মকটেস্টে বসার সুযোগ। পাবেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ইভিএসের সম্পূর্ণ নোটস। একদম বিনামূল্যে। তাছাড়া কিছু মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগও পাবেন। বিশদ জানতে শনি রবিবার ১টা থেকে ৩টের মধ্যে চলে আসুন কলেজ স্ট্রীটে।

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের ‘Inclusive Postal Course’। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাশ টেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাশ করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9038786000
✆ 9674478644

Website : www.academicassociation.in ▪ Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-9674447451 • Darjeeling-9832041123 • Berharampur-9775333007

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্তি

তত্ত্ব ও তথ্য

সংখ্যাতত্ত্ব বড় অদ্ভুত জিনিস। কখনও বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। আবার কখনও বাস্তবকে লুকিয়ে চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করে। এই পরিসংখ্যানের খেলা অনুযায়ী ভারতে দারিদ্রের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। অথচ আসল ছবিটা একটু অন্যরকম। অর্থাৎ আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ সম্পর্কে যেভাবে তুলে ধরা হত বা হয়; গবেষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন তা কতটা ত্রুটিপূর্ণ। লিখছেন **শ্রীপদ মতিরাম।**

গত তিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে দেশের মোট জাতীয় আয় (গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম) বেড়েছে। ২০১৫-র অর্থনৈতিক সমীক্ষা সে কথাই বলছে। নবম (১৯৯৭-২০০২), দশম (২০০২-২০০৭) এবং একাদশতম (২০০৭-২০১২) পরিকল্পনার সময়কালে এই বৃদ্ধির গড় হার ছিল যথাক্রমে ৫.৬, ৭.৬ এবং ৭.৮ শতাংশ। ভারতের অতীতের তুলনায় তো বটেই, যেকোনও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেই এই হার নজর কাড়ার মতো। তাই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ভারত অর্থনীতির সেই 'হিন্দু হারের বৃদ্ধি'-র (হিন্দু রেট অব গ্রোথ) শনির দশা অবশেষে কাটিয়ে উঠেছে আর নব্বইয়ের গোড়া থেকে সত্যিই যেন দেশ দারুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে বিকাশের পথে। তবে, কিছু সংশয় থেকেই যায়। দেশের এই আর্থিক বৃদ্ধি কি সর্বাত্মক? দরিদ্র বা অন্যান্য পিছিয়ে থাকা মানুষদের কাছেও কি পৌঁছতে পেরেছে এই আর্থিক বিকাশের সুফল? এ ব্যাপারে অনেক পর্যবেক্ষকই সন্দেহ প্রকাশ করেন। অর্থনীতির গবেষণায় এবং দেশের নীতি নির্ধারণের আলোচনায় 'অন্তর্ভুক্তি' (ইনক্লুশান), 'অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা' (ইনক্লুসিভনেস) এবং 'অন্তর্ভুক্তি-সহ বিকাশ' অর্থাৎ সর্বাত্মক বা সার্বিক বিকাশ (ইনক্লুসিভ গ্রোথ)-এর যে বিষয়গুলি বার বার উঠে আসে, আন্দাজ করা যায় যে তার থেকেই দানা বেঁধেছে এমন সন্দেহ।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৎকালীন যোজনা কমিশন স্পষ্টতই জোর দিয়েছিল এই সর্বাত্মক বা অন্তর্ভুক্তি-সহ বিকাশ বিষয়টির ওপর। এই ধরনের বিকাশের লক্ষণ কি তার একটা আভাসও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, "দারিদ্র হ্রাস, স্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন, সর্বস্তরের শিশুদের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, উচ্চশিক্ষাকে সাধারণের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সর্বাত্মক বিকাশের আওতায় পড়ে। এছাড়া উচ্চহারে বেতন বা মজুরির সুযোগ গড়ে তোলা এবং তার ফলে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সর্বাত্মক বিকাশের অঙ্গ। এছাড়া আছে জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ, আবাসন, স্যানিটেশন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলির প্রসার ও উন্নতি। তফশিলভুক্ত জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।" (যোজনা কমিশন, ২০১১)।

এমন কয়েকটা কথা যে সর্বাত্মক বিকাশ সম্পর্কে তেমন কোনও স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে সাহায্য করে না তা আমি আগেই অন্যত্র আলোচনা করেছি। আসলে সর্বাত্মক বিকাশের বিষয়টি নানা জনে নানাভাবে দেখেছেন। সম্প্রতি, সংখ্যায় কম হলেও, কিছু গবেষণা পত্রে এই ধরনের বিকাশকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। সর্বাত্মক বিকাশের প্রকৃত অর্থ কী? ভারতের আর্থিক বিকাশ কি সর্বাত্মক? অর্থাৎ সে বিকাশের সুফল কি সমস্ত ভারতবাসী ভোগ করেন? এই নিবন্ধে, সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রশ্ন দুটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আগেই বলে রাখা ভালো, ভারতের বিকাশ কখনওই সর্বাত্মক নয়। এমন হওয়ার কারণগুলিও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

অন্তর্ভুক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায়?

আগেই বলেছি যে অন্তর্ভুক্তির ধারণা নানা জনের কাছে নানা রকম। ভারতের নীতি নির্ধারক ও গবেষকরা দারিদ্র হ্রাসের হারের বিষয়টির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে দারিদ্র হ্রাসের হার যত দ্রুত হবে আর্থিক বিকাশ যে সর্বাত্মক তা প্রমাণিত হবে।

একটু বিশদে আলোচনা করা যাক ব্যাপারটা নিয়ে। নীতি প্রণেতারা দারিদ্রের পরিমাপ করেন সরকারি দারিদ্রসীমার এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষা পরিচালিত পঞ্চবার্ষিকী সমীক্ষার ভিত্তিতে। জনসাধারণের আয় সম্পর্কে পরিষ্কার কোনও তথ্য না থাকায় ব্যয়ের তথ্যের ভিত্তিতেই এই সমীক্ষা গৃহীত হয়। দারিদ্রের সব থেকে কার্যকরী পরিমাপ হচ্ছে মাথাপিছু অনুপাত (HCR)। দারিদ্রসীমার নীচে শতকরা কত মানুষ আছেন, সেই সংখ্যাই হল মাথাপিছু অনুপাত। যদি ২০০৪ থেকে ২০০৫ এবং ২০০৯ থেকে ২০১০-এর মাথাপিছু অনুপাত হয় যথাক্রমে $HCR_{2004-05}$ এবং $HCR_{2009-10}$ তাহলে এই পাঁচ বছরে দারিদ্র হ্রাসের হার দাঁড়ায় $(HCR_{2004-05}-HCR_{2009-10})/5$। $HCR_{2004-05}$ এবং $HCR_{2009-10}$-এর নির্দিষ্ট মানগুলি বসালে এই গড়ের মান দাঁড়ায় ৪.৪। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৪-০৫-এর এগারো বছরের সময়কালে কিন্তু ওই একই হারের মান ছিল কেবল ২.২ (থোরাট ও দুবে, ২০১২)। ২০০৯-১০-এর পর রীতি ভেঙে মাত্র দুই বছর পরেই ২০১১-১২-তে জাতীয় নমুনা

সমীক্ষা দপ্তর (NSSO) আবার এক বড় সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে তৎকালীন যোজনা কমিশন লক্ষ করে যে এই অল্প সময়ে দারিদ্র কমেছে নাটকীয়ভাবে। রিপোর্টে বলা হয়, "সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সাম্প্রতিক সাত বছরের সময়কাল, অর্থাৎ ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২-র মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের হার, ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৪-০৫-এর এগারো বছরের সময়কালের ওই একই হারের তুলনায় বেড়েছে প্রায় তিনগুণ।" (যোজনা কমিশন, ২০১৩)।

অন্তর্ভুক্তি পরিমাপের এই পদ্ধতিটি এমনিতে সহজ এবং এর ফলাফল বুঝতেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু পদ্ধতিটির গোড়াতেই গলদ। দারিদ্রসীমা যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিয়ে আছে অনেক বিতর্ক। 'ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' (উদাহরণ : সুব্রহ্মণিয়ান, ২০১৪)-র মতো পত্রিকায় বিভিন্ন সমালোচকদের লেখা পড়লেই বোঝা যায় যে দারিদ্রসীমার মান এত নীচে ধার্য করা হয় যে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দারিদ্রসীমার মান নীচু হলেই তা দারিদ্রের হার কমিয়ে আনবে। এছাড়াও রয়েছে অন্য একটি পদ্ধতিগত সমস্যা। সর্বাত্মক বিকাশের পরিসর আসলে ব্যাপক। দ্বাদশ পরিকল্পনায় সর্বাত্মক বিকাশের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তার থেকে অন্তত এইটুকু স্পষ্ট হয়। এমন ব্যাপক একটি বিষয়ের বিচার শুধুমাত্র দারিদ্র হ্রাসের পরিমাপে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। চাই ব্যাপকতর কোনও পরিমাপ পদ্ধতি। আগে থেকেই কোনও একটি নির্দিষ্ট দারিদ্রসীমার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তির পরিমাপ না করে যদি পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত বিচারে দারিদ্রসীমাটি নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে হয়তো এই সমস্যার এক সমাধান পাওয়া যেতে পারে। মতিরাম ও নরপরাজু (২০১৫) প্রায় এমনই এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তারই সঙ্গে তারা সাহায্য নিয়েছেন জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তরের ভোগজনিত ব্যয়ের (কনজাম্পশান এক্সপেন্ডিচার) ভিত্তিতে গৃহীত সমীক্ষার। দরিদ্র মানুষের উপার্জন পর্যাপ্ত হারে বেড়েছে কি না তাই মূলত বিচার করেছেন মতিরামেরা। আগের মতো, এ ক্ষেত্রেও আয়ের সঠিক কোনও তথ্য না থাকায় ব্যবহার করা হয়েছে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যই। দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২-র এই সাত বছরে গ্রামের মানুষের ব্যয় ক্ষমতা বেড়েছে ২২ শতাংশ হারে। শহরের মানুষের ক্ষেত্রে এই হার ২৭ শতাংশ। কিন্তু শহরে বা গ্রামের দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে এই হার একভাবে বাড়েনি। এর থেকেই বোঝা যায় যে দেশের ধনী ও মধ্যবিত্তদের যে গতিতে বিকাশ হয়েছে তার তুলনায় দরিদ্রদের বিকাশ হয়েছে বা হচ্ছে অনেক ধীরে। শহরের ক্ষেত্রে আবার এই ফারাকটা একটু বেশিই চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে ১০০ জনের মধ্যে যে ১০ জন সব থেকে দরিদ্র তাদের ব্যয়ের ক্ষমতা বেড়েছে ২০.৩ শতাংশ হারে। আর শহরাঞ্চলে দরিদ্রতম দশের ওই একই হার দেখা যাচ্ছে ২৪.৫ শতাংশ। গ্রামে বা শহরে থাকা একজন মধ্যবিত্তের ব্যয় ক্ষমতা বৃদ্ধির হার কিন্তু এর চেয়ে অনেকটাই বেশি যথাক্রমে ২২ এবং ২৭ শতাংশ। একশো জনের মধ্যে ধনীতম দশের ক্ষেত্রে এই হার স্বভাবতই আরও অনেক বেশি, গ্রামে ২৩.১ শতাংশ এবং শহরে ২৯.১ শতাংশ। ওই একইভাবে মতিরাম ও নরপরাজু দেখিয়েছেন যে তফশিলভুক্ত জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক বা শহরের অস্থায়ী শ্রমিকদের মতো নিম্নবিত্ত শ্রেণিগুলির মধ্যেও এই বৃদ্ধির হার যথেষ্ট নয়। এই গবেষণা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারতের এই আর্থিক বিকাশ সত্যিই সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।

আরও অনেক গবেষক ভিন্ন পন্থা অবলম্বনে এই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এদের কাজের মধ্যে বিশেষ কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা হল। ডি জয়রাজ এবং এস সুব্রহ্মণিয়ান টেনেছেন 'তালমুদিক্ সম্পত্তি সমস্যা'-র (তালমুদিক্ এস্টেট প্রবলেম) উদাহরণ। কোনও সম্পত্তি বেশ কয়েকজন দাবিদারের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়া সংক্রান্ত যে সমস্যা তার আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন অন্তর্ভুক্তির ধারণাটাকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণের সীমিত বাজেট কীভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় সেই উদাহরণের উল্লেখও করেছেন তারা। ২০১২ সালের (এ) গবেষণাপত্রে জয়রাজ এবং সুব্রহ্মণিয়ান প্রথমে বেছে নিয়েছেন জনসংখ্যার দরিদ্রতম ১০ শতাংশকে। এদের থেকে অবস্থা যাদের সামান্যই ভালো, সেই ১০ শতাংশকে বাছা হয়েছে তারপরে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দেশের পুরো জনসংখ্যাকে অনেকগুলি অংশে ভাগ করে এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ চালিয়েছেন তারা। সুষ্ঠুভাবে দেশের বিকাশের সুফল ভাগ করতে গেলে দেশের জনসংখ্যার এমন একটা অংশের আদর্শ ব্যয় ক্ষমতা কত হওয়া উচিত তারই সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ওই একই অংশের আদত ব্যয় ক্ষমতার। কেবল একটা আদর্শ ব্যয় ক্ষমতারই নয়, তুলনা করা হয়েছে এই রকমের বিভিন্ন সম্ভাব্য আদর্শ ব্যয় ক্ষমতার। তাদের এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে তারা প্রথমে ধরে নিয়েছেন দুটি সময়কাল ১ এবং ২। ধরা যাক, সময়কাল ২-এর সুফল নিম্নতম অংশ থেকে শুরু করে একের পর এক উচ্চতর অংশগুলোয় বণ্টন করা হল। খেয়াল রাখা হল যেন এমন বণ্টনের ফলে সব থেকে বেশি সংখ্যক অংশের গড় আয় সমান হয়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজনে উচ্চতম জনসংখ্যা অংশগুলির কয়েকটিকে যদি বিকাশের সুফলের থেকে পুরোপুরি বঞ্চিতও করা হয় তাও ক্ষতি নেই। বণ্টনের এই আভিধানিক 'ম্যাক্সিমিন' পদ্ধতি সমানভাবে বিকাশের সুফল ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে বা অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সব থেকে কার্যকরী। ভাবা হয়েছে, এর প্রায় বিপরীত এক প্যারেটো ধর্মী (প্যারেটো রেসপেক্টিং ইক্যুয়াল ডিস্ট্রিবিউশান) বণ্টনের পদ্ধতির কথাও। জনসংখ্যার প্রতিটি অংশের, সময়কাল ১-এর গড় আয় যদি বজায় রাখা হয় আর তারপর সময়কাল ২-এর থেকে পাওয়া আর্থিক বিকাশের সুফলের দশ ভাগের এক ভাগ করে যদি দেওয়া হয় প্রতি অংশকে তাহলে এক গড়পড়তা অন্তর্ভুক্তিই সম্ভব হয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে জয়রাজেরা দেখান যে দেশের বিকাশের বাস্তবে যেভাবে বণ্টন হয়েছে তা গড়পড়তা

অন্তর্ভুক্তির আদর্শটিকেও ছুঁতে পারেনি। যদি গড়পড়তা অন্তর্ভুক্তিটুকুও সম্ভব করা যেত তাহলে গ্রামের দরিদ্রতম ২০ শতাংশের ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৯-১০-এর মধ্যে বিকাশের বার্ষিক হার হত ২.৮৮ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে, ওই একই সময়কালে, এই বার্ষিক হার হয়েছে কেবল ১.৪৩ শতাংশ। শহরের ক্ষেত্রে এই তফাত আরও প্রকট, গড়পড়তা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ৪.৩৯ শতাংশ এবং বাস্তবে ১.২৭ শতাংশ। ২০১২ সালের (বি) গবেষণাপত্রে জয়রাজ এবং সুব্রহ্মণিয়ান প্রায় ওই একই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তবে এবারে নিয়েছেন এক আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ। সূর্যনারায়ণ এবং দাস (২০১৪) তাদের গবেষণাপত্রে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করেছেন কর্মসংস্থান, আয় এবং ব্যয়ের এক ত্রিমাত্রিক কাঠামোর সাপেক্ষে। এর জন্য তারা মেপেছেন—(১) প্রতি শতাংশ গড় আয় বৃদ্ধিতে গড় ব্যয় পরিবর্তনের শতাংশ, (২) প্রতি শতাংশ গড় ব্যয় পরিবর্তনে ব্যয়ের মধ্যগ মানের (মিডিয়ান) পরিবর্তনের শতাংশ এবং (৩) ৬০ শতাংশেরও নীচে যাদের ব্যয়ের মধ্যগ মান সেই জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল এক গুণাঙ্ক, যাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তি গুণাঙ্ক (ইনক্লুসিভ কো-এফিশিয়েন্ট)। প্রথমটির থেকে জানা যায় যে গড় আয় এবং ব্যয় কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে এক স্থিতিস্থাপক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়টি আবার বলে দেয় গড় ব্যয় এবং ব্যয়ের মধ্যগ মানের স্থিতিস্থাপক সম্পর্কের কথা। এই দুটি স্থিতিস্থাপকতার মান যদি একের চেয়ে বেশি হয় আর গুণাঙ্কটির মান যদি হয় অনেকটাই বেশি তাহলেই বলা যায় যে দেশের বিকাশে সকল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনওটাই হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এই দুইয়ের নিরিখেই ব্যাপারটা বিচার করেছেন সূর্যনারায়ণেরা, তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। দেখা গেছে যে, ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০১১-১২-র এই ক'বছরে অন্তর্ভুক্তি গুণাঙ্ক ০.৭৪৮ থেকে কমে হয়েছে ০.৭১১। সুতরাং, তাদের মতে, দরিদ্রতম মানুষের, দেশের এই আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত যেন এক দুরন্ত আশা ছাড়া কিছু নয়।

আলোচনা এবং উপসংহার

একথা সত্যি যে গত দশ বছরে দেশের সব মানুষেরই গড় আয় কিছুটা হলেও বেড়েছে। সরকারি দারিদ্রসীমার সাপেক্ষে দেখলে মেনে নিতেই হয় যে দেশের দারিদ্র সমস্যাকে কিছুটা হলেও বাগে আনা গেছে। তবে শুধু এইটুকু হলেই দেশের আর্থিক বিকাশে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হবে না। এই নিবন্ধে আলোচনা করেছি কীভাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা একটা ব্যাপকতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝলে দেখা যায় যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তা এখনও কষ্ট কল্পনাই। এমন হওয়ার কারণগুলি বুঝতেও খুব একটা অসুবিধা হয় না। একদিকে, দেশের চাষবাসের অবস্থা তেমন ভালো নয় এবং অনেক গবেষক তো এমনও বলছেন যে ভারতীয় কৃষি আপাতত এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে কোনওরকমে এগিয়ে চলেছে। আবার অন্যদিকে, নগরাঞ্চলে চলে আসা সংকটাপন্ন কৃষক শ্রেণির মানুষগুলোর জন্য বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্যও তেমন কোনও কর্মসংস্থান করা যায়নি। বিভিন্ন গবেষকের মতে, যেটুকু কর্মসংস্থান হয়েছে তা কেবল নির্মাণ সংক্রান্ত এবং তাও আবার শুধুমাত্র গ্রামের দিকেই। এমন নির্মাণ কাজ খুব একটা অর্থকরী তো নয়ই আবার তা থেকে শ্রমিকরা এমন কিছু দক্ষতাও অর্জন করেন না যার মাধ্যমে অন্য কোনও উন্নততর কর্মসংস্থান হতে পারে। উৎপাদন শিল্প এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, বিশেষত শ্রমিক নির্ভর উৎপাদন তো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অনেক সহজ করে তুলতে পারে, কিন্তু দেশের উৎপাদন শিল্পের অবস্থাও ভালো নয়। এখন একমাত্র ভরসা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। এই প্রকল্পটি আরও শক্তিশালী করে তুললেই একমাত্র দেশের দরিদ্র মানুষদের বাঁচানো সম্ভব। এরই সঙ্গে দরকার এমন কিছু নতুন প্রকল্প যার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ নতুন কাজ শিখে স্বনির্ভর হতে পারে। সরকারি বিনিয়োগে নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে দেশের আর্থিক বিকাশ হয়েছে। কিন্তু তার মানেই যদি ধরে নেওয়া হয় যে অন্তর্ভুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে তা হলে প্রকৃত আর্থিক বিকাশ অধরাই থেকে যাবে।❑

[লেখক মুম্বইয়ের ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ-এর অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয়সমূহ উন্নয়নমূলক অর্থনীতি, কল্যাণমূলক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি।
email : sripad@igidr.ac.in]

উল্লেখপঞ্জি :

Economic Survey (2015) *Economic Survey* : 2014-15, Government of India, New Delhi.

Jayaraj, D. and S. Subramanian (2012 a) "On the Interpersonal Inclusiveness of India's Consumption Expenditure Growth", XLVII (45), pp. 56-66.

Jayaraj, D. and S. Subramanian (2012 b) "On the Inter-group Inclusiveness of India's Consumption Expenditure Growth", XLVII (10), pp. 65-70.

Motiram, S. and K. Naraparaju (2015) "Growth and Deprivation in India : What Does Recent Evidence Suggest on 'Inclusiveness'?" *Oxford Development Studies,* 43(2), pp. 145-164.

Planning Commission (2011) "Faster, Sustainable and More Inclusive Growth : An Approach to Twelfth Five-Year Plan," Government of India, New Delhi.

Planning Commission (2013) "Press Note on Poverty Estimates, 2011-12", Government of India, New Delhi.

Subramanian, S. (2014) "Getting the Poverty Line Again...and Again", *Economic and Political Weekly,* XLIX (47), pp. 66-70.

M.H. Suryanarayana and M. Das (2014) "How Inclusive is India's Reform(ed) Growth?" *Economic and Political Weekly,* XLIX (6), pp. 44-52.

Thorat, S. and A. Dubey (2012) "Has Growth Been Socially Inclusive during 1993-94-2009-10?" XLVII (10), pp. 43-54.

Vasavi, A. (2015) "Vexations of Agrarian India", *Live Mint,* April 30.

ভারতে সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তন

অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতের ক্ষেত্রে ছবিটা তেমন নয়। উচ্চ বিকাশ হার সত্ত্বেও খাদ্য সুরক্ষা, অপুষ্টি দূর, কর্মসংস্থানের মতো সামাজিক মাপকাঠিগুলির নিরিখে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে। কীভাবে এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব, সার্বিক বা সর্বাত্মক বিকাশ কীভাবে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত অসাম্য দূর করে নতুন ভারত গড়তে পারে, **এন আর ভানুমূর্তি** *এবং* **বর্ষা শিবরাম** *তারই আলোচনা করেছেন এই নিবন্ধে।*

২০১৪-১৫ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-র বিকাশ হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। চলতি বছরে এই হার ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে অধিকাংশ বিশ্লেষকের ধারণা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি মনে করছে, চলতি বছরেই বিকাশ হারের নিরিখে ভারত, চীনকে টপকে যাবে। বিকাশশীল বাজার অর্থনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে ভারত। কিন্তু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাপেক্ষে বিচার করলে ভারতের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। এ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১৮টি নির্ণায়কের মধ্যে ভারত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে মাত্র ৪টিতে। বাকিগুলির ক্ষেত্রে ভারত হয় লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত অথবা তার কাজের গতি নেহাতই গড়পড়তা। অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক মাপকাঠির মধ্যে এই বৈপরীত্য কেন?

সহজভাবে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক বিকাশের অর্থ হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনও অর্থনীতির উৎপাদন বৃদ্ধির হার। কিন্তু এই বৃদ্ধি যে সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে হবেই, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এজন্যই ভারত এমন এক বিকাশ কৌশল গ্রহণ করেছে, যা সর্বাত্মক ও সুস্থিত।

বিশ্ব ব্যাংক বিকাশের গতি ও ধরনের দিক থেকে সার্বিক বা সর্বাত্মক বিকাশের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে। অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কতটা এবং তার সুফল কতদূর পৌঁছচ্ছে, তাই এখানে বিচার্য। সার্বিক বা সর্বাত্মক বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন শ্রমশক্তির বৃহত্তর অংশ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অঞ্চল নির্বিশেষে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর সুফল ভোগ করবে। অর্থাৎ বিকাশকে হতে হবে দরিদ্র সহায়ক। বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সাধারণত দরিদ্রদের মধ্যে আয়ের পুনর্বণ্টনের কথা বলে, কিন্তু দরিদ্রদের আয় সৃষ্টির দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় না। লেখালেখি ও নীতি প্রণয়নের সময়ে দারিদ্র ও বিকাশের কথা আলাদাভাবে বলে এই দুইয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতে সর্বাত্মক উন্নয়নের কথা শোনা যাচ্ছে। এর অর্থ, শুধু দরিদ্রদের জন্যই নয়, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়া।

২০০৮ সালের আগে ভারতের বিকাশ হার বেশ উঁচু ছিল। ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮ সময়কালে গড় বিকাশ হার ছিল ৯ শতাংশের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সেভাবে সৃষ্টি হয়নি। বস্তুতপক্ষে এই বিকাশকে বলা হত কর্মসংস্থানহীন বিকাশ। দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নেও এই বিকাশ তেমন কোনও ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এজন্যই এখন সর্বাত্মক বিকাশের ধারণার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এই উচ্চহারের বিকাশ সার্বিকভাবে না হয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকায় দেশের আঞ্চলিক অসাম্য বাড়ে। সারণি-১-এ রাজ্যগুলির গড় বিকাশ হারের সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের বিভিন্ন মাপকাঠি তুলে ধরা হল।

বিকাশ হারের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে কতটা অসাম্য রয়েছে, তা সারণি-১ থেকেই স্পষ্ট। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলি গত তিন বছরে গড়ে ৮ শতাংশের বেশি বিকাশ হার অর্জন করলেও কর্ণাটক, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির বিকাশ হার গড়ের নীচে। আবার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের মাপকাঠির দিকে তাকালে দেখা যায়, বিহার ১০.৩ শতাংশ বিকাশ হার অর্জন করলেও এক্ষেত্রে তার ফলাফল নিরাশজনক। ভারতে যে রাজ্যগুলিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবথেকে বেশি, বিহার তাদের অন্যতম। অর্থাৎ এখানে বিকাশের সুফল সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছোয়নি। একই অবস্থা ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি মাপকাঠির অন্তত ৫টিতে এরা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের নিরিখে সবথেকে ভালো কাজ হচ্ছে গোয়া, কেরালা ও ত্রিপুরায়। সবকটি মাপকাঠিতেই এরা জাতীয় গড়ের থেকে এগিয়ে। তামিলনাড়ু, মিজোরাম, মহারাষ্ট্র ও হিমাচলপ্রদেশেও কাজের গতি সন্তোষজনক। ৮টির মধ্যে অন্তত ৭টি মাপকাঠিতে এরা জাতীয় গড়ের থেকে ওপরে। সারণি-১-এ প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, বিকাশ হার ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের মাপকাঠির নিরিখে রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাপক অসাম্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিকাশ হার ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাবার তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ।

তাহলে অর্থনৈতিক বিকাশকে সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলে কী করতে হবে? রাজ্যগুলির মধ্যেকার অসাম্য দূর করতেই বা কী ব্যবস্থা নেওয়া হল? গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। দ্বাদশ পরিকল্পনার খসড়ায় তার উল্লেখ রয়েছে। তবে যে তিনটি বিষয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল কর্মসংস্থান, খাদ্য সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

আমাদের মতে, দেশে সর্বাত্মক বিকাশের মূল উপাদান হল অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। রিজার্ভ ব্যাংক এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে,

সারণি-১

রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সংক্রান্ত মাপকাঠিগুলির সাম্প্রতিক প্রবণতা

রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গড় বিকাশ হার (শেষ তিন বছরের গড়)	মাথাপিছু দারিদ্র গণনা অনুপাত (২০১১-১২)	কম ওজনের শিশুর অনুপাত (২০০৫-০৬)	NER (২০১৩-১৪)	পুরুষের সাক্ষরতার সাপেক্ষে মহিলা সাক্ষরতার অনুপাত (১৫-২৪ বছর)	IMR (২০১৩)	প্রসবের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত (২০০৯)	ভৌগোলিক এলাকার সাপেক্ষে বনাঞ্চলের শতকরা হার (২০১৩)	শৌচাগারহীন পরিবার (গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় শতাংশের হিসাবে) [NSS-২০১২]
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬.১৫	৯.২	২৯.৮	৪৩.৫৬*	০.৯২	৩৯	৯৫.৬	১৬.৮*	৩৮.৭
অরুণাচলপ্রদেশ	৫.৬৪*	৩৪.৬৭*	২৯.৭	৫০.১২	০.৯	৩২	৭১.৯*	৮০.৪	১০
আসাম	৫.৭৫	৩১.৯৮*	৩৫.৮	৫০.৩২	০.৯৩	৫৪*	৬৫.৫*	৩৫.৩	১২
বিহার	১০.৩১	৩৩.৭৪*	৫৪.৯*	৩৫.৯৮*	০.৮*	৪২*	৫৩.২*	৭.৭*	৬৭.৪*
ছত্তিশগড়	৬.২২	৩৯.৯৩*	৪৭.৮*	৫১.৮৯	০.৯	৪৬*	৫৬.৪*	৪১.১	৬৫.৭*
গোয়া	১২.১৬	৫.০৯	২১.৩	৭২.৯১	০.৯৯	৯	৯৯.৮	৫৯.৯	৬.৭
গুজরাট	৭.৮১	১৬.৬৩	৪১.১*	৪৪.৮৮*	০.৯২	৩৬	৮৫.২	৭.৫*	৩৪.৪
হরিয়ানা	৬.৬৯	১১.১৬	৩৮.২	৪৬.২	০.৯৩	৪১*	৬৯.৩*	৩.৬*	১৬.৭
হিমাচলপ্রদেশ	৬.৫৬	৮.০৬	৩১.১	৬৮.০৭	০.৯৯	৩৫	৫৩.৭*	২৬.৪	২২.১
জম্মু-কাশ্মীর	৫.৮৭	১০.৩৫	২৪	৩৯.৫৬*	০.৮৫*	৩৭	৮২.৯	১০.১*	৩৫.২
ঝাড়খণ্ড	৬.৯৪	৩৬.৯৬*	৫৪.৬*	৪৪.৩৮*	০.৮২*	৩৭	৪৭.৩*	২৯.৫	৭৩.৯*
কর্ণাটক	৪.৮৫*	২০.৯১	৩৩.৩	৫৪.০১	০.৯৫	৩১	৮৮.৪	১৮.৮*	৪৪.৮*
কেরালা	৮.১০	৭.০৫	২১.২	৭৩.৭৯	১	১২	৯৯.৯	৪৬.১	২.৩
মধ্যপ্রদেশ	১০.২২	৩১.৬৫*	৫৭.৯*	৪৪.৭৬*	০.৮৭*	৫৪*	৮২.৯	২৫.২	৬০.৭*
মহারাষ্ট্র	৬.৫৭	১৭.৩৫	৩২.৭	৫৬.২৭	০.৯৭	২৪	৮৫.৫	১৬.৫*	৩৩.৫
মণিপুর	৬.৮৭	৩৬.৮৯*	১৯.৫	৭২.৮৯	০.৯৫	১০	৮২.৭	৭৬.১	০.৯
মেঘালয়	৯.০৬	১১.৮৭	৪২.৯*	৩৮.২৯*	১.০২	৪৭*	৬৫.২*	৭৭.১	৩.৬
মিজোরাম	২.৩৪*	২০.৪	১৪.২	৫৩.৯৮	০.৯৬	৩৫	৮৫.১	৯০.৪	০.৩
নাগাল্যান্ড	৭.১০	১৮.৮৮	২৩.৭	৪০.৭৫*	০.৯৮	১৮	৪৩.৮*	৭৮.৭	০
ওড়িশা	৫.৮২	৩২.৫৯*	৩৯.৫	৪৭.২৩	০.৮৯*	৫১*	৭৯.১	৩২.৩	৭১.৮*
পাঞ্জাব	৫.৪৭*	৮.২৬	২৩.৬	৪৭.৪৮	০.৯৮	২৬	৬৬.৭*	৩.৫*	১৫.৬
রাজস্থান	৪.৭৬*	১৪.৭১	৩৬.৮	৪১.০৪*	০.৭৮*	৪৭*	৭৫.৮*	৪.৭*	৫৭.২*
সিকিম	৮.৭৫	৮.১৯	১৭.৩	২৬.১৪*	০.৯৮	২২	৬৯.৯*	৪৭.৩	০.১
তামিলনাড়ু	৬.০২	১১.২৮	২৫.৯	৬১.৫৯	০.৯৮	২১	৯৮.৬	১৮.৩*	৪১.১
ত্রিপুরা	৮.৭০	১৪.০৫	৩৫.২	৮৭.৯৫	০.৯৬	২৬	৮৩.১	৭৫	১.২
উত্তরপ্রদেশ	৫.৫৪*	১১.২৬	৪১.৬*	৩৬.৬৭*	০.৮৭*	৫০*	৬৪.২*	৬*	১৬.১
উত্তরাখণ্ড	৬.৮৭	২৯.৪৩*	৩১.৭	৪৬.৩৭	০.৯৬	৩২	৫৮.৭*	৪৫.৮	৬০.১*
পশ্চিমবঙ্গ	৬.৬৯	১৯.৯৮	৩৭.৬	৪১.৬৬*	০.৯৬	৩১	৭২.৬*	১৮.৯*	২৯.৪
সারা ভারত	**৫.৬০**	**২১.৯**	**৪০.৪**	**৪৫.৬৩**	**০.৯১**	**৪০**	**৭৬.২**	**২১.২**	**৪৩.৪৩**

তথ্যসূত্র : http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20162.pdf

বি.দ্র. : * চিহ্ন—যেসব রাজ্যের অবস্থান জাতীয় গড়ের তুলনায় খারাপ।

এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত দুর্বলতর ও দরিদ্র শ্রেণির কাছে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং তাঁদের সাধ্যের মধ্যে থাকা খরচে আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা চালু হওয়ার আগে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। অর্থাৎ দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বিকাশ ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতেন না। সরকারের এই উদ্যোগে প্রায় ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় এসেছেন। চলতি বছরের জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী, এই অ্যাকাউন্টগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা আছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি খোলায় রাতারাতি হয়তো মানুষের সঞ্চয় প্রবণতার পরিবর্তন হবে না, কিন্তু বণ্টন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে তুলতে এই নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনধন-আধার-মোবাইল JAM ত্রিবেণী সঙ্গম : ফারাক ঘোচানোর লক্ষ্যে

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বৃদ্ধি ও ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে হলেও দরিদ্র মানুষের কাছে এবং গ্রামীণ এলাকায়

পরিষেবা এখনও সেভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। এ জন্য জনধন যোজনার পর সরকার একটি সার্বিক অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২০১৪-১৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনাকে তথ্যপ্রযুক্তি ও আধার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে তা পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার খোলনলচে বদলে দেবে। এর সুবাদে সমাজের সবথেকে নীচের স্তরে থাকা মানুষজনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় আসবেন, আধার সংখ্যার সাহায্যে তাঁরা জনধন যোজনায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। নেটওয়ার্কগুলির এই সংযুক্তিকরণ, দক্ষ ও নিশ্ছিদ্র সুবিধা হস্তান্তরে সহায়ক হবে। বৃত্তি, বিমা, ভরতুকি এমনকী পেনশন সংক্রান্ত সুবিধাও এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যাবে।

MGNREGA—অতীতের গৌরবজনক সাফল্য

সামাজিক উন্নয়নের পরবর্তী লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা। আগেই বলা হয়েছে, ভারতের সাম্প্রতিক বিকাশকে 'কর্মসংস্থানহীন বিকাশ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই এবার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর সরকারকে জোর দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (২০০৫)—MGNREGA-র মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক একে 'গ্রামোন্নয়নের তারকাখচিত নিদর্শন' আখ্যা দিয়েছে। এটি অনেকাংশে চাহিদা-নির্ভর কর্মসূচি হওয়ায় অর্থনীতির পক্ষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থিতিশীলতা আনার কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির মধ্যে MGNREGA-কে সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়ক বলে মনে করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার প্রবণতা MGNREGA-তে অনেক বেশি, যা সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিতে প্রায় দেখাই যায় না। MGNREGA-তে চিহ্নিতকরণ, প্রয়োগ ও মজুরি প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয় e-FMS বা বৈদ্যুতিন তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে। সামাজিক নিরীক্ষা হওয়ায় স্থানীয় মানুষজন এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন রাজ্যে এর বাস্তবায়ন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও, ব্যাংকিং ও ডাক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা MGNREGA-কে দেশের সফলতম সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলির একটি বলে মনে করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংক ও ডাকঘরের মাধ্যমে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করায় এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অ্যাকাউন্ট গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৬০ লক্ষে। এই অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ছে, দরিদ্র মানুষজন ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন, যাঁদের কাছে কখনও পৌঁছানো যায়নি, MGNREGA সেই সব প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ৮১ শতাংশ কাঁচা বাড়িতে বাস করেন, ৬১ শতাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন এবং ৭২ শতাংশের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই।

MGNREGA ব্যাপকভাবে মহিলাদের পাশেও দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, গত ৮ বছরে এই কর্মসূচিতে মোট যত কাজ দেওয়া হয়েছে, তার ৫৩ শতাংশেরও বেশি পেয়েছেন মহিলারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে।

আধারভিত্তিক হস্তান্তর, ব্যাংকিং নেটওয়ার্ককে উন্নত করে তোলার যেসব প্রয়াস সাম্প্রতিককালে শুরু হয়েছে, তা এই কর্মসূচির দক্ষতা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাপনের মানের উত্তরণ ঘটাবে।

খাদ্য সুরক্ষা : সময়ের চাহিদা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাদ্য সুরক্ষা বলতে বোঝায় সব মানুষের সব সময়ে পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর খাবার পাওয়া। উচ্চ ও দ্রুত বিকাশশীল বাজার অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে ভারতের পরিসংখ্যান শোচনীয়। UNICEF-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে পাঁচ বছরের নীচে থাকা দশ লক্ষ শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মারা যায়। তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি ও গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অপুষ্টির হার সর্বাধিক। রাজ্যওয়াড়ি হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে অপুষ্টিজনিত সমস্যা সবথেকে বেশি। খিদের দিক থেকে দেখতে গেলে ২০১৪ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭৬টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ৫৫তম স্থানে। এ ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুর মৃত্যুহার, কম ওজনের শিশুর সংখ্যা, মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা প্রভৃতিকে মাপকাঠি হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

উদ্বেগজনক এই পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ভরতুকিতে খাবার দেওয়া হবে। এর সঙ্গে গণবণ্টন ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল, সংযুক্ত শিশু উন্নয়ন পরিষেবার মতো প্রকল্পগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রয়াসের জেরে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টিগত মানের উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার, খাদ্য সুরক্ষা আইন পাশ হয়েছে দু'বছর আগে, অথচ এখনও তা কার্যকর করা হয়নি। আইনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে বলে কেউ কেউ বলছেন। যাই হোক না কেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় থমকে থাকার অর্থ, সরকার খাদ্য সুরক্ষা সমস্যার সমাধানে ততটা আন্তরিক নয়। এটি রাজ্যের এক্তিয়ারে থাকায়, রাজ্য সরকারগুলিও এই নিশ্চেষ্টতার দায় এড়াতে পারে না।

উপসংহার

বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা ঘোচাতে ভারত সম্প্রতি প্রয়াসী হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সাফল্য এখনও কয়েকটি অঞ্চল ও গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে ব্যাংকিং ও আধার নেটওয়ার্কের সংযুক্তিকরণ গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে বলে আশা করা যায়, আঞ্চলিক অসাম্য ঘুচিয়ে সার্বিক সামাজিক লক্ষ্য পূরণেও তা সহায়ক হবে। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, রাজ্য সরকারগুলিকে এই ফারাক ঘোচাতে এগিয়ে আসতে হবে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের পর রাজ্য-স্তরে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কাটছাঁট করা হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে। তাই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রকল্প প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে এখন রাজ্যগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।❑

[এন আর ভানুমূর্তি নতুন দিল্লির NIPFP-র অধ্যাপক।

email : nrbmurthy@gmail.com

বর্ষা শিবরাম নতুন দিল্লির 'ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ ফর উইমেন'-এর সঙ্গে যুক্ত।

email : varsha.sivaram15@gmail.com]

ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা

দেশের নাগরিকদের কাছে সুলভ মূল্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে ১৯৬৫ সালে চালু হয়েছিল গণবণ্টন ব্যবস্থা। তারপর গত পাঁচ দশক এই ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে যে ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন পরে তা হয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক। এই লক্ষ্যপূরণের অঙ্গ হিসাবে কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা বাদ দেওয়া হবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নেও দেখা দেয় নানান জটিলতা। আবার অনেক রাজ্যে ডিলার, সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ আঁতাতে পুরো ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কখনও বা নজরদারির অভাবে গণবণ্টন সামগ্রী খোলাবাজারে পাচার হয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করতে বিভিন্ন রাজ্যের তরফে সংস্কারমূলক কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন **সি এস সি শেখর।**

সুলভ মূল্যে সকলের কাছে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিতে ১৯৬৫ সালে ভারতে চালু হয় গণবণ্টন ব্যবস্থা বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিডিএস)। এই ব্যবস্থার আওতায় রাজ্য সরকারগুলি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে। খাদ্যশস্যের প্রকৃত মূল্য ও বিতরণ মূল্যের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সেটুকু সরকার খাদ্য ভরতুকি হিসাবে দিয়ে দেয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গণবণ্টন ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন এবং মূলত শহরাঞ্চলেই এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল। গণবণ্টন ব্যবস্থার এই ত্রুটির যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে চালু হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থা বা টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (টিপিডিএস)। এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় প্রত্যেক রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক দারিদ্রসীমার বিচারে উপকারভোগীদের চিহ্নিত করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকেই এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় সস্তায় খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। তার চেয়েও দরিদ্র পরিবারগুলিকে বলা হয় অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পরিবার (এএওয়াই)। দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী বা বিপিএল পরিবারগুলি যে দামে খাদ্যশস্য পায় অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পরিবার তার থেকেও কম দামে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিই বিপিএল এবং এএওআই-এর আওতায় প্রকৃত উপকারভোগীদের চিহ্নিত করে থাকে। লক্ষ্যভিত্তিক অন্য যেকোনও কর্মসূচির মতোই টিপিডিএস-ও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কতজনকে এর আওতায় আনা হবে কতজনকেই বা বাদ দেওয়া হবে সেই প্রশ্নে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এই ব্যবস্থাতেও রয়েছে।

রাজ্যভেদে গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক ফারাক রয়েছে। এই ব্যবস্থার আওতায় থাকা মানুষের সংখ্যা, যোগ্যতার মাপকাঠি এবং রূপায়ণের বিচারে রাজ্যভেদে এই গণবণ্টন ব্যবস্থার বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন তালিমনাড়ুর সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য, ডাল বা ভোজ্যতেল কালোবাজারির কথা প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে; অথচ বিহারে গণবণ্টন ব্যবস্থার সামগ্রীর পাচারের ঘটনা আকছারই ঘটে। তবে সাম্প্রতিক অতীতে বিহারের গণবণ্টন ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। জাতীয় স্তরের মূল্যায়নে বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হয়নি। এই কারণেই আমরা সামগ্রিকভাবে কয়েকটি রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যস্তরের গণবণ্টন ব্যবস্থার কাজ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব এবং কোন কোন বিষয়ের জন্য রাজ্যভেদে গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে তা বোঝার জন্য বিশেষ করে বিহার ও ছত্তিশগড়ের ওপর আলোকপাত করব। বিভিন্ন রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার কাজ ও ফলাফল বিশ্লেষণের আমরা মূলত রাজনৈতিক অর্থনীতির (পলিটিক্যাল ইকোনমি) কাঠামো ব্যবহার করব।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বিশ্লেষণমূলক কাঠামো

এখানে যে মূল প্রশ্নটি রয়েছে বিশ্লেষণের জন্য প্রধান দুটি পন্থা রয়েছে—

(১) নব্য ক্ল্যাসিক্যাল সর্বোচ্চ কল্যাণসাধন পন্থা (নিও ক্ল্যাসিক্যাল ওয়েলফেয়ার ম্যাক্সিমাইজেশন অ্যাপ্রোচ)।

(২) রাজনৈতিক অর্থনীতির পন্থা (পলিটিক্যাল ইকোনমিক অ্যাপ্রোচ)।

প্রথাগত সর্বোচ্চ কল্যাণসাধনের মডেলে অর্থ বাজারের ব্যর্থতা ও দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থাই মূল বিষয়। এখানে সরকারকে সর্বজ্ঞ এবং মঙ্গলময় এক অস্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনীতিবিদ পিগু-র তত্ত্ব (১৯৩২) থেকেই এই ধারণা জন্ম নিয়েছে। কী কী কারণে বাজার যথাযথভাবে সহায়সম্পদ বরাদ্দ ও বণ্টনে ব্যর্থ হয় তার ওপর জোর

দেওয়ার পাশাপশি এই গলদগুলি দূর করার জন্য বেসরকারি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই তত্ত্বে। রাষ্ট্রই জনসাধারণের ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন করে, সামাজিক মূল্য ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ভারসাম্য ঘটায়, 'ডিক্রিজিং কস্ট' শিল্প (চাহিদা বাড়ার কারণে প্রতিযোগিতার বাজারে নতুন নতুন সংস্থা আসার ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যাওয়ার যে ঘটনা ঘটে থাকে)-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিবিদ প্যারেটো প্রদর্শিত সর্বাপেক্ষা কাম্য পথে (প্যারেটো অপটিমাল ওয়ে) আয়ের পুনর্বণ্টন করে থাকে (ম্যাককরমিক এবং টলিসন, ১৯৮১)। এই মডেলে সরকারকে পরিশীলিত সর্বজ্ঞ, মঙ্গলময় এক অস্তিত্বরূপেই কল্পনা করা হয়েছে।

পিগুর তত্ত্বের প্রত্যুত্তর হিসেবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির মডেলের জন্ম। এই মডেলে সর্বজ্ঞ ও মঙ্গলময় রাষ্ট্রের ধারণাকে নাকচ করে বিনা খরচে একেবারে নিখুঁতভাবে বাজারের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সংশোধন করে দেওয়ার পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাজারের ব্যর্থতাগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা করতে গিয়ে সরকার নিজেও যে ব্যর্থ হতে বাধ্য—এই যুক্তিই তুলে ধরা হয়েছে রাজনৈতিক অর্থনীতির মডেলে। কারণ সরকার নিজেই বেশকিছু সংখ্যক আইনবিষয়ক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব কিছু লক্ষ্য রয়েছে সেগুলি প্রায়শই পরস্পরের স্বার্থবিরোধী। রাজনীতিবিদ ভোটদাতা, চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং আমলারা নিজস্ব স্বার্থে যে আচরণ করেন তার ওপরও মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই তত্ত্বে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এর ফলে অর্থনীতির বিধান ও সরকারের পদক্ষেপের মধ্যে গড়ে ওঠা পার্থক্য অনেক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে সাহায্য করে রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব (ম্যাককরমিক এবং টলিসন, ১৯৮১)।

পরীক্ষাভিত্তিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ (এমপিরিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমি অ্যানালিসিস)

এই বিশেষ মডেলে রাজনৈতিক অর্থনীতির বাজারে বিভিন্ন অংশীদার বা এজেন্টের আচরণের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সেই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সরকারের অগ্রাধিকারগুলিকে স্থির করা হয়। রাজনৈতিক অগ্রাধিকার কর্মকাণ্ড বা পলিটিক্যাল প্রেফারেন্স ফাংশনস (পিপিএফ) মডেলে আবার নীতি রচয়িতারা অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা করবেন এটা ধরে নিয়ে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কোন নীতি কতটা প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে তাকে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অঙ্গ হিসাবেই দেখা হয়। পিপিএফ মডেলের সপক্ষে যে যুক্তিগুলো দেওয়া হয় তা হল এই মডেলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের নিরিখে (যেমন কল্যাণমূলক উদ্বৃত্ত, লাভ, কৃষিকাজে মোট আয়, সরকারে বাজেট ব্যয় ইত্যাদি) কাজকর্মের বিচার করা যায় এবং এই মডেলেই চাপসৃষ্টিকারী প্রতিটি গোষ্ঠীর (প্রেশার গ্রুপ) কল্যাণের দিকটি প্রতিফলিত হয়। এখানে অগ্রাধিকারগুলোর পরিমাপ করা এই কারণেই সম্ভব কারণ তা পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের ফলাফলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন নীতির অন্তর্নিহিত প্রশ্নগুলির মীমাংসার ক্ষেত্রেও পিপিএফ সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে কৃষিসংক্রান্ত নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। এই অন্তর্নিহিত প্রশ্ন বা বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মূল্য, মূল্য প্রদানে ঘাটতি, আমদানি কোটা ইত্যাদি এবং সরকারের রাজস্ব আদায়, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পরিমাপের যুক্তিকে সামনে রেখে 'লিনিয়ার অ্যাডিটিভ পিপিএফ'-এর ধারণাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই পিপিএফ মডেলের সঙ্গে মঙ্গলময়, সর্বজ্ঞ সরকারের প্রথাগত ধারণার অনেক মিল রয়েছে। তবে সমাজে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় এদের কে কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে তার স্বীকৃতির প্রশ্নেই দুটি মডেলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছে। সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যে একটা বিশেষ কাঠামো রয়েছে পিপিএফ মডেলে তার কথা বলা হলেও অগ্রাধিকারের এই কাঠামো সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কিছু বিশেষ আচরণের দ্বারা পরিচালিত একক অস্তিত্ব হিসাবেই এখন সরকারকে দেখা হয়। রাজনৈতিক বাজারের বিশদ এক মডেল তৈরির প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিমূর্ত নীতি নির্ধারকের এক কৃত্রিম ধারণাকে খাড়া করা হয় এই তত্ত্বে। যেসমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংস্থা (এজেন্ট) অগ্রাধিকারের মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে মূলস্রোতের পিপিএফ ঘরানায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনও প্রচেষ্টাই হয়নি।

বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী

পরীক্ষামূলক বিভিন্ন সমীক্ষা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা। নীতি রচনার প্রক্রিয়া ভালো করে বুঝতে গেলে রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি (বর্ধন ১৯৮৪, শেখর ২০০৫)। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা সামগ্রিকভাবে ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে এ দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। এ দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিক কর্মপ্রণালী বেশ জটিল। নির্বাচনে লড়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির অর্থের প্রয়োজন এবং শিল্পপতি বা কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের মতো কিছু বাছাই করা গোষ্ঠীই এই অর্থ জোগাতে পারে। তাই যেসব স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব বা আধিপত্য সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এর ফলে নীতিরচনা ও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির স্বাধীনতা অনেকটাই খর্ব হয়ে যায়। যে স্বার্থগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় অর্থ জোগায় তাদের পছন্দ অনুযায়ী নীতি রচনা করতে হয় রাজনৈতিক

দলগুলিকে। তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য অর্থসংগ্রহ বেশিরভাগ স্বার্থগোষ্ঠীর কাছেই অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আর এই কারণে নীতি রচনার ক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর, দীন-হীন দরিদ্রদের কথা কোনও গুরুত্বই পায় না। কারণ তারা রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে অর্থ ঢালতে পারে না। তাই তারা চির উপেক্ষিত।

এখানে তথ্যের অসামঞ্জস্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য সংক্রান্ত অসামঞ্জস্য থাকলে রাজনৈতিক দলগুলি সেই গোষ্ঠীরই পক্ষ নেয় যেখানে তথ্য সচেতন সদস্যের সংখ্যা বেশি। এই কারণে নিজেদের সপক্ষে নীতি প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রভাবিত করতে গেলে নিজেদের সদস্যদের আরও তথ্য সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য স্বার্থগোষ্ঠীগুলির আরও সহায়সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক পদ্ধতি ছাড়াও আরও একটি উপায়ে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য তারা সরাসরি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। মানবাধিকার রক্ষা বা শিল্প দূষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতির ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার জন্য বিক্ষোভ, সমাবেশ আয়োজনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে পারে এই ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি। তবে এটা নির্বাচন বা আইনগত পদ্ধতির মধ্যে না গিয়ে দরকষাকষির পথে সমাধানের একটা চেষ্টামাত্র।

চিত্র-১

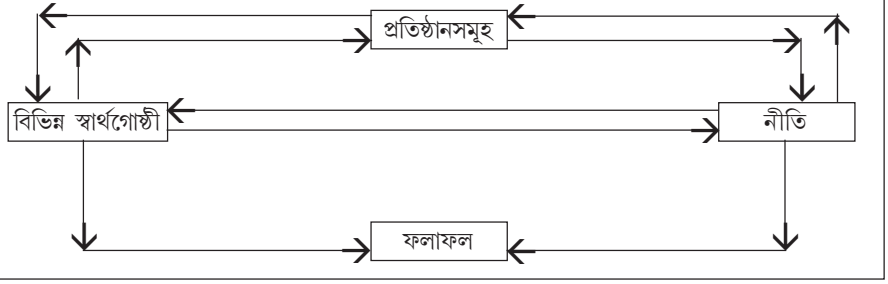

চিত্র-২

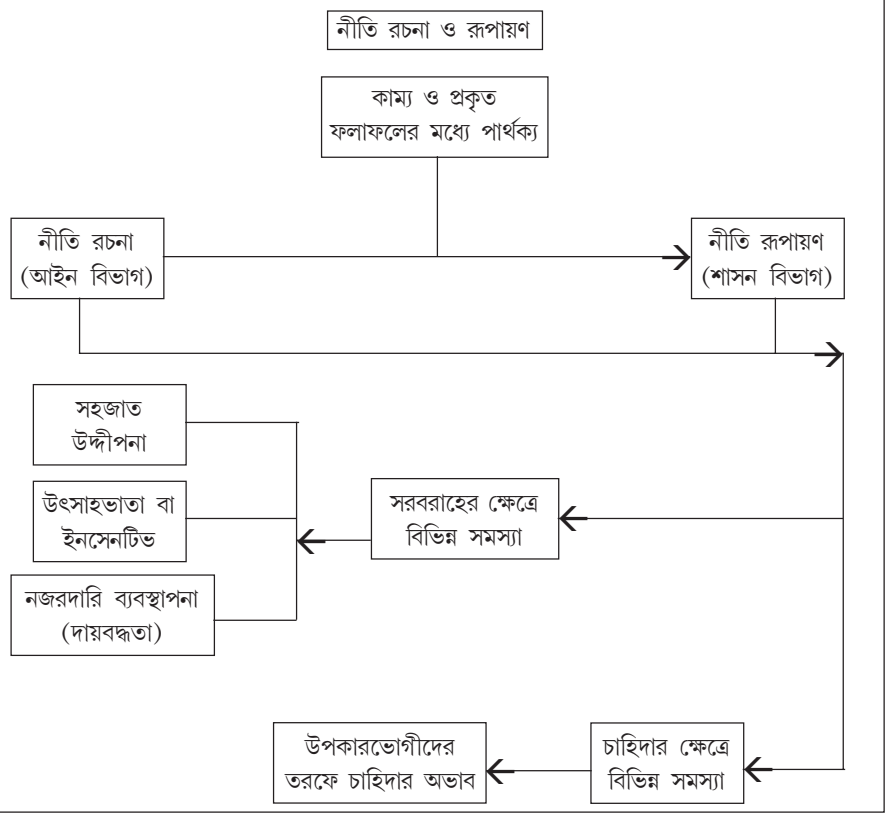

তৃতীয় অধ্যায় : ছত্তিশগড় ও বিহারে গণবণ্টন ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিহার ও ছত্তিশগড়ের গণবণ্টন ব্যবস্থার কাজ ও ফলাফল নিয়ে বিশদে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে।

ছত্তিশগড়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগেই গণবণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে অনিয়মিত সরবরাহ ও খোলাবাজারে খাদ্যশস্যের পাচার মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যাগুলির সমাধানে কতকগুলি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করা হয় যার মধ্যে প্রধান হল ২০০৪ সালে জারি করা ছত্তিশগড় গণবণ্টন ব্যবস্থা (সিপিডিএস) আদেশনামা। এই আদেশবলে বেশিকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেমন—

- বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ব্যবস্থার অবসান ঘটানো।
- খাদ্যশস্য সরাসরি রেশন দোকানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।
- খাদ্যশস্য বিতরণকারী ট্রাকগুলিকে হলুদ রং করা।
- ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে প্রতি মাসের ৭ তারিখে মধ্যে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা।
- কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণকারী ট্রাকগুলিকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা।
- গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আধা-সার্বজনীন (৮০ শতাংশ) করে জনসাধারণের একটা বড় অংশের কাছ থেকে উন্নত পরিষেবার চাহিদা বাড়ানোর ব্যবস্থা।
- ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালকদের কমিশন কুইন্টালপিছু ৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে

৩০ টাকা করা, যাতে তাদের তরফে ক্রেতাদের ঠকানোর প্রবণতা কমে।

● প্রত্যেক বাড়ির বাইরের দেওয়ালে গৃহকর্তার নাম ও রেশন কার্ডের ধরন ও মূল্যের বিশদ বিবরণ রং দিয়ে লিখে দেওয়া। যাতে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত পরিবার বিপিএল এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড ব্যবহার করছেন তাদের ধরা যায়।

বিহারের গণবণ্টন ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন ধরেই বহু সমস্যায় জর্জরিত। সমস্ত স্তরে খাদ্যশস্যের নয়ছয়, বিতরণ ব্যবস্থার অসংগতি (কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কাদের বাদ দেওয়া হবে সেই সংক্রান্ত ত্রুটি), রাজ্যে খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি, বিহার রাজ্য খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ নিগমের (বিএসএফসিএসসি) বেহাল দশা, ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি, তথা গণবণ্টন ব্যবস্থার ডিলার, সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এমনকী মন্ত্রীদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এবং সর্বোপরি এ রাজ্যের শ্লথ আর্থিক বিকাশের ফলে সীমিত সম্পদ সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে চলে যাওয়ার দরুনই যাবতীয় সমস্যার উৎপত্তি।

একটি সরল রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোর মাধ্যমেই ছত্তিশগড় ও বিহারের গণবণ্টন ব্যবস্থার কাজকর্মের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (চিত্র-১ এবং ২)। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সরকারি নীতির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক বহুমুখী এবং উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীদারের ওপর এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে (চিত্র-১)। এর দরুন একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক প্রভাবিত হয় যার ছাপ চূড়ান্ত ফলাফলেও পড়ে। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণেই মূলত কাম্য ও প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য রয়ে যায়। সহজাত উদ্দীপনার অভাব, উৎসাহভাতা বা ইনসেনটিভ দেওয়ার যথাযথ কাঠামো না থাকা এবং উপযুক্ত নজরদারি ব্যবস্থাপনার অভাবই সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মূল কারণ। আর উপকারভোগীরাও জোর গলায় তাদের দাবি জানান না। আর এটাই চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যার মূল কারণ। সমষ্টিগত কাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখেই উপকারভোগীরা তাদের দাবির কথা বিশেষ জানাতে চান না।

উপরোক্ত কাঠামো দুটির ভিত্তিতে বিহার ও ছত্তিশগড়ের পার্থক্য ভালোভাবে বোঝা যাবে। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে অনিয়মিত সরবরাহ এবং খোলাবাজারে ব্যাপক মাত্রায় খাদ্যশস্যের পাচারের কারণেই কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে গণবণ্টন ব্যবস্থায় মূল সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছিল। সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসাহভাতা বা ইনসেনটিভ প্রদানের উপযুক্ত কাঠামো না থাকার কারণে তথা যথাযথ নজরদারি ব্যবস্থার অভাবেই এই সমস্যার উদ্ভব (চিত্র-২)। সিপিডিএস আদেশনামা প্রয়োগের মাধ্যমে ছত্তিশগড় সরকারের হস্তক্ষেপ গোটা পরিস্থিতিটাই বদলে দেয়। ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালকদের কমিশন কুইন্টালপিছু ৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করার ফলে উৎসাহভাতা বা ইনসেনটিভ কাঠামোও অনেক উন্নত হয়েছে। এর ফলে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালকদের তরফে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য সামগ্রী পাচার করে বাড়তি রোজগারের প্রবণতা কমেছে। অন্যদিকে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণকারী ট্রাকের ওপর নজরদারি চালানো বা এই ধরনের ট্রাকগুলিকে হলুদ রং করার ফলে বিতরণ ব্যবস্থায় অনেক স্বচ্ছতা এসেছে। কারণ এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকার ফলে ট্রাকগুলি নির্দিষ্ট বিতরণকেন্দ্র থেকে অন্য কোনও জায়গায় খাদ্যসামগ্রী সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় উপকারভোগীদের সংখ্যা বাড়ানোর ফলে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতাও বেড়েছে। চাহিদার দিকটি অনেক মজবুত হয়েছে (চিত্র-২)। গণবণ্টন ব্যবস্থায় আরও বেশি সংখ্যক উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা, গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় বণ্টিত সামগ্রীর মূল্য কমানো, কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থার প্রচলন, রেশন দোকানগুলিকে বেসরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত করা এবং অভিযোগ নিরসনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করার ফলেই এ রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। চাহিদা ও সরবরাহের উন্নতি ঘটার ফলে মাত্র এক দশকের মধ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছত্তিশগড় একটি আদর্শ রাজ্য হিসাবে উঠে এসেছে। সিপিডিএস নীতির ফলে উপকারভোগীরাই একটি স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে উঠে এসেছেন যার ফলে চাহিদার দিকটি শক্তিশালী হয়েছে (নীতি—স্বার্থগোষ্ঠীর যোগসূত্র, চিত্র-১)।

সমস্ত স্তরে খাদ্যশস্যের নয়ছয়, বিতরণ ব্যবস্থার অসংগতি (কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কাদের বাদ দেওয়া হবে সেই সংক্রান্ত ত্রুটি), রাজ্যে খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি, বিহার রাজ্য খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ নিগমের (বিএসএফসিএসসি) বেহাল দশা, ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি তথা গণবণ্টন ব্যবস্থার ডিলার, সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এমনকী মন্ত্রীদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এই সমস্ত নানান সমস্যায় ২০১১ সাল পর্যন্ত বিহারের গণবণ্টন ব্যবস্থা জর্জরিত ছিল (মুইজ, ১৯৯৮, ২০০১)। রাজ্যে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি থেকে যাওয়ার ফলে এই ক্ষেত্রে কোনও শক্তিশালী চাপ সৃষ্টিকারী-গোষ্ঠী বা লবি গড়ে উঠতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের শ্লথগতি এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর বৈষম্য গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রধান উপকারভোগী দরিদ্র জনসাধারণকে কার্যত অক্ষম করে রেখেছে। নাগরিক সমাজ বা সংবাদ মাধ্যমের তরফেও কোনও তৎপরতা না থাকার কারণে গণবণ্টন ব্যবস্থার বিষয়টি কোনও নির্বাচনী ইস্যু হয়ে ওঠেনি; যেমনটা কিনা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুতে। একটি কার্যকর গণবণ্টন ব্যবস্থার জন্য উপকারভোগী, সংবাদ মাধ্যম, নাগরিক সমাজ, নিষ্ঠাবান আমলা তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তরফে সুস্পষ্ট ও জোরদার দাবি থাকতে হবে।

গত কয়েক বছরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিহার সরকার গৃহীত কিছু বিশেষ উদ্যোগের ফলে গত তিন বছরে বিশেষ করে বিগত বারো মাসে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অনেক উন্নতি হয়েছে (দ্রেজ এবং খেরা, ২০১৫)। ২০১১ সাল নাগাদ শনাক্তকরণ কুপন চালুর পরই এই উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। গত তিন বছরে বিশেষ করে বিগত বারো মাসে সংস্কারমূলক আরও বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক

জাতভিত্তিক সুমারির (সোশিও-ইকোনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেনসাস) তথ্য ব্যবহার করে রেশন কার্ডের নতুন তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বিহারের গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৭৫ শতাংশ পরিবারের কাছেই নতুন রেশন কার্ড বা অন্ত্যোদয় কার্ড রয়েছে। এখন অধিকাংশ মানুষই এটা জানেন যে গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এ রাজ্যের নির্বাচনী বিতর্কেও উঠে এসেছে গণবণ্টন ব্যবস্থার ইস্যু। এর ফলে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, আলাপ-আলোচনার পরিসরেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিরোধী দলগুলিও জনসাধারণকে তাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করছে। এর ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থার উপকারভোগীরা আরও বেশি করে চাপ সৃষ্টি করছেন। অথচ কয়েক বছর আগেও ছবিটা ছিল একদম উলটো। সাধারণ মানুষ তখন গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে প্রায় কিছুই পেতেন না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে মূলত প্রশাসনিক উদ্যোগের হাত ধরেই বিহার ও ছত্তিশগড়ের গণবণ্টন ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটেছে এবং তার ফলে চাহিদা যেমন জোরদার হয়েছে তেমনই সরবরাহেরও উন্নতি হয়েছে।

অন্যান্য রাজ্যের অভিজ্ঞতা

নীতি রচনা ও রূপায়ণে উন্নতি সাধনের এই জাতীয় বিভিন্ন উদ্যোগ অন্যান্য রাজ্যেও ফলপ্রসূ হয়েছে (খেরা, ২০১১এ এবং বি; রাঘব পুরী, ২০১২)।

হিমাচলপ্রদেশে গণবণ্টন ব্যবস্থা সর্বজনীন (তবে সবার ক্ষেত্রে এক নয়)। এখানে বিপিএল পরিবারগুলিকে (দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী) এপিএল (দারিদ্রসীমার ওপরে অবস্থানকারী) পরিবারগুলির তুলনায় কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। আবার খাদ্যশস্য ছাড়া গণবণ্টন ব্যবস্থা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী (ডাল ও ভোজ্য তেল) সব পরিবারের কাছে একই মূল্যে বিতরণ করা হয়। দুর্গম অঞ্চলে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা তো রয়েছেই তার ওপর তামিলনাড়ুর মতো নজরদারি ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই এ রাজ্যে। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা সফল হয়েছে কারণ এই ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করার ফলে উপকারভোগীদের তরফে চাহিদা বেড়েছে।

তামিলনাড়ুতে বেশকিছু সময় ধরে সাধারণ মানুষের উপযোগী ও সস্তায় প্রযুক্তি ব্যবস্থা করে এক কার্যকরী নজরদারি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। গোটা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আনতেই সহজ-সরল ব্যয়সাশ্রয়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এক কার্যকর ও সুষ্ঠু গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অন্য কোনও রাজ্য এতটা ভাবনা-চিন্তা করেনি (আলামু, ২০১১)।

অন্ধ্রপ্রদেশে সহজ-সরল মাপকাঠির ভিত্তিতে উপকারভোগীদের বাদ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থায় উপকারভোগীদের তালিকা থেকে কাদের বাদ দেওয়া যেতে পারে সেই সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব কমানো গেছে। তবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। অন্যদিকে, ২০০৮ সাল থেকে ছত্তিশগড় মডেল অনুসরণ করছে ওড়িশা। এই উদ্যোগেরই অঙ্গ হিসাবে কোরাপুট-বোলাঙ্গির-কালাহান্ডি অঞ্চলে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা হয়েছে। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির হাতে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানেও ২০১০-এর মে মাস থেকে এই জাতীয় কিছু সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, যার সুফলগুলি এখন সুস্পষ্ট। সম্ভবত ঝাড়খণ্ডেই বিপিএল তালিকা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এবং যে তালিকা রয়েছে তা বহু পুরোনো। তবে ঝাড়খণ্ডেও সম্প্রতি গণবণ্টন ব্যবস্থায় সংস্কারসাধনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গণবণ্টন ব্যবস্থায় ১ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থার আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে

গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিসর সম্প্রসারিত করা, এই ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য কমানো, কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থার প্রচলন, রেশন দোকানগুলির ওপর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানো, সমষ্টিগত উদ্যোগে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা তথা অভিযোগ নিরসনের যথাযথ বন্দোবস্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানের কমিশন বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নিয়ে অধিকাংশ রাজ্যই এক কার্যকর গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিসর সম্প্রসারিত করে চাহিদা বাড়ানো এবং একটি কার্যকর গণবণ্টন ব্যবস্থায় উপকারভোগীদেরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে তার ফলেই গণবণ্টন ব্যবস্থার এই পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে।❑

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর।
email : csekhar@iegindia.org
sekharcsc@yahoo.com]

Roll 0202845
Anirban Mallick

প্রিলি - মেইন
প্রথম থেকে এখানে
একসাথে করানো
হয়। **(LRO/2011)**

Roll 0201935
Anupam Chakraborty

কুইক কার্ড
এর মাধ্যমে প্রস্তুতি
নিয়েছি। তাই **IT Sector**-এ
কাজ করতে করতেও
1 বারে **BDO (2012)**

Roll 0109111
Ratan Sarkar

প্রথম থেকে সেন্টারের
দেওয়া স্ক্যানার ব্যবহার
করেছি। তাই বেশি
পড়তে হয়নি।
(BDO/2012 - CTO/2013)

Roll 0109111
Afiful Haque

প্রথম থেকে
অপশনালের
ক্লাস পেয়েছি
(Regst./2013)

Roll 105815
Jhantu Palit

এখানকার
Exam - memory technique
খুব কাজে লেগেছে।
অযথা নেগেটিভ হয়নি।
(CI/2012)

Roll 0108067
S. Nag

কোন ম্যাগাজিনের
কতটুকু পড়তে হয়
তাও শিখেছি ক্লাসে।
(LRO/2013)

Roll 1205162
Chinmoy Panja

এখানকার লিসনিং
মেথড -এ খুব
তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি
নিতে পেরেছি।
(Mis./2011)

তোমরা যারা নতুন,

- প্রথমেই ঠিক করে নাও কি পড়বে - কিভাবে পড়বে, এজন্য পুরনো প্রশ্নপত্র দেখো, নিজে না পারলে অভিজ্ঞ কাউকে দেখিয়ে নাও। অপশনালের জন্য চাই রিপ্রেজেনটেশন স্টাইল।
- প্রিলি হোক বা মেইন রিপিটেড **Zone** এর প্রশ্ন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ভাবো। যেমন কলিঙ্গ যুদ্ধ -- অশোক এই অংশ প্রিলি ও মেইন এ গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এটাও জেনে রাখো কলিঙ্গযুদ্ধে অশোকের সেনাপতি কে ছিলো? যারা নতুন এবং বার বার ব্যার্থ তারা আমাদের সেন্টারে **WBCS** নিউক্লি -তে আসতে পারো।

প্রিলি মেইন অপশনালের জন্য ফোন করেই দেখো না।

5 টিচার্স গ্রুপ **দমদম (H.O) • মেমারী • কাটোয়া** (সন্ধ্যায়ও ক্লাস হয়)

Phone : 9593411432

C/o ডেভিড স্যার

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

কৃষিকে সার্বিক বিকাশের হাতিয়ার করে তোলা

কৃষিভিত্তিক দেশ ভারত। অথচ ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র নানাবিধ গভীর সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে তা যে শুধু দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক হবে তাই নয়, কৃষি হয়ে উঠবে সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের হাতিয়ার। সরকার গত এক বছরে যেসব কল্যাণমুখী প্রকল্পের সূচনা করেছে, সেগুলি কীভাবে কৃষির চালচিত্র আমূল পালটে দিতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন **ভুবন ভাস্কর।**

আমাদের মতো কৃষিভিত্তিক সমাজে, কৃষিকে কেন্দ্রে না রাখলে, কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনাই যে সফল হবে না, তা বলা বাহুল্য। এর একটা কারণ হল, জাতি হিসাবে আমরা বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য উপভোক্তাদের অন্যতম এবং সেজন্য আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কৃষিক্ষেত্রকে সজীব ও সক্ষম রাখা দরকার। কিন্তু এছাড়াও আরও বড় একটা কারণ আছে। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, সামাজিক-অর্থনৈতিক এমনকী সাংস্কৃতিকভাবেও কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু এ সত্ত্বেও, দেশের কৃষিক্ষেত্র যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে রয়েছে, তা বিশ্বাস করা শক্ত। এর শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে সেই স্বাধীনতালাভের সময়ে। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অসামান্য দূরদর্শিতাসম্পন্ন নেতা, জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'আমি শিল্পের জন্য, ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য যতই গলা ফাটাই না কেন, আমাকে বলতেই হবে, কৃষি অন্য যে কোনও শিল্পের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এটা শুধু একটা বিবৃতি নয়, পরবর্তী সাত দশক জুড়ে এটাই আমাদের কৃষিসংক্রান্ত জাতীয় নীতির প্রস্তাবনা হিসাবে কাজ করেছে। একের পর এক সরকার কৃষির অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করেছে ঠিকই, কিন্তু নীতি প্রণয়নের সময়ে তার কোনও ছাপ পড়েনি। কৃষিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভাগ্যের ওপর। নেহরু বলেছিলেন, শিল্পই হল আধুনিক ভারতের মন্দির। এতেই নির্ধারিত হয়ে গেছে কৃষিক্ষেত্রের বিধিলিপি। স্বাধীন ভারতে কৃষি থেকে গেছে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েই।

এই কৃষিবিমুখতার ফলে দুটো জিনিস দেখা দিয়েছে। প্রথমত, আমাদের উৎপাদনশীলতা ও শস্য বিভিন্নতার হার ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি, আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির প্রতিটি দিকে পিছিয়ে পড়েছে। কৃষিই তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। সেচ, ফলন-পরবর্তী সুবিধা, গবেষণা কেন্দ্র, ঋণলাভের সহজ ব্যবস্থার মতো পরিকাঠামোগত সহায়তা না মেলায় তাদের আয় ক্রমশ কমেছে। গভীরতর হয়েছে গ্রামীণ ও শহুরে ভারতের মধ্যেকার বিভাজন।

ছয়ের দশকের গোড়ায় ভারত যখন দুর্ভিক্ষের করাল আশঙ্কার মুখোমুখি, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সবুজ বিপ্লবের পথে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই বিপ্লব শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল, বহু শস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছিল আমাদের দেশ। তবে এই বিপ্লবের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শস্য উৎপাদনের এলাকা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সার্বিক বা সর্বাত্মক বিকাশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে একে কখনওই ভাবা হয়নি। সবুজ বিপ্লবে সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়লেও একইসঙ্গে বেড়েছিল চাষের খরচও। বছরের পর বছর ধরে আমরা রাসায়নিকের ব্যবহার বাড়িয়েই গেছি। সেজন্যই আজ, সবুজ বিপ্লবের সব থেকে বেশি সুবিধাভোগী পাঞ্জাবকে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, কৃষির অত্যধিক ব্যয়, কৃষিজমিতে ক্ষতিকর উপাদানের মতো সমস্যাগুলির সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

২০০৩ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার প্রথমবার ভারতীয় কৃষির ফলন-পরবর্তী সমস্যার দিকে চোখ রেখে কৃষি উৎপাদন বিপণন কমিটি আইন তৈরি করেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কমিটিগুলি স্থানীয় রাজনীতিবিদদের আখড়া হয়ে ওঠে। তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য যত বেশি সম্ভব দাম স্থির করা। এই ব্যবস্থাপনা নিয়েই এখন বিতর্ক দেখা দিয়েছে, অর্থমন্ত্রক ইতিমধ্যেই ফল ও শাকসবজিকে এই আইনের আওতা থেকে মুক্ত করেছে। সার্বিক বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল শস্যবিমা।

ভারতীয় কৃষির ইতিহাসে এই প্রথম, কেন্দ্রীয় সরকার, কৃষিকে কেবল পেট ভরাবার উপায় হিসাবে না দেখে একে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে ভাবছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বেশকিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত হলে ভারতীয় কৃষির শিকড় অনেক মজবুত হবে। আসুন, এমন কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা যাক।

(১) **জাতীয় কৃষি বাজার :** কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাম্প্রতিক প্রয়াস ফলন-পরবর্তী কৃষি ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চালচিত্রটাই বদলে দিতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি গত ২ জুলাই কৃষি-কারিগরি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে জাতীয় কৃষিবাজার স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পে সরকার দেশজুড়ে ৫৮৫টি পাইকারি বাজারকে অনলাইনে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য ২০১৫-১৬ থেকে তিনটি অর্থবর্ষে মোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকের পর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, 'এবার থেকে গোটা রাজ্যের জন্য একটিই লাইসেন্স থাকবে, মাশুল একবারই ধার্য করা হবে। মূল্য নির্ধারণের জন্য হবে বৈদ্যুতিন নিলাম। এর ফলে গোটা রাজ্য একটাই বাজারে পরিণত হবে। রাজ্যের মধ্যে থাকা খণ্ড খণ্ড বাজারগুলির অবলুপ্তি ঘটবে।' চলতি অর্থবর্ষেই ২৫০টি, ২০১৬-১৭-তে ২০০টি এবং ২০১৭-১৮ সালে ১৩৫টি মান্ডিকে এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় কৃষি বাজার তৈরি হয়ে গেলে রাজ্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের অবাধ যাতায়াতের পথ সুগম হবে। এতে কৃষকের কাছে বাজারের আয়তনটা অনেক বেড়ে যাবে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বাজারগুলি সংযুক্ত হলে কৃষকরা ফসলের আরও ভালো দাম পাবেন, সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নতি হবে,

অপচয় কম হবে এবং অভিন্ন ই-প্ল্যাটফর্মের সংস্থান-সহ একটি সংযুক্ত জাতীয় বাজার গড়ে উঠবে বলে সরকার মনে করছে।

বাজার ও কৃষকের মধ্যে যোগসূত্র না থাকার সুযোগ নিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীরা মুনাফার একটা বড় অংশ নিজেদের পকেটে পোরে। ই-প্ল্যাটফর্ম চালু হলে চিরকালীন এই সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে কর্ণাটক ইতিমধ্যেই পথ দেখিয়েছে। কর্ণাটক সরকার ও NeML-এর যৌথ অংশীদারিত্বে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ই-মার্কেটস সার্ভিসেস লিমিটেড—ReMS। পণ্য বিনিময় এক্সচেঞ্জ NCDEX-এর ১০০ শতাংশ অধীনস্থ এই সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের ১৫৫টির মধ্যে ৫৫টি বাজারকে এক লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় একে জাতীয় কৃষি বাজারের একটি মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং, দেশের ২৩টি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের সামনে এর কার্যপ্রণালী তুলে ধরেন।

(২) **মাটি স্বাস্থ্য প্রকল্প :** মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করেছিলেন। তাঁর লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও এর উল্লেখ ছিল। ক্ষমতায় আসার পর এনডিএ সরকারের প্রথম বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই প্রকল্পের জন্য ১৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এর মধ্যে ৫৬ কোটি টাকা খরচ হবে দেশজুড়ে একশোটি ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের সুরতগড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সয়েল হেল্‌থ কার্ড' প্রকল্পের সূচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার কৃষিকে দারিদ্র্য দূর করার হাতিয়ার হিসাবে দেখছে। চলতি বছরের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য অর্থবরাদ্দ বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। গত ২৮ এপ্রিল কৃষিমন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চলতি বছরে মোট ২ কোটি ৫৩ লক্ষ নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এর অর্ধেক ব্যয় বহন করবে রাজ্যগুলি। নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, কেমিস্ট-কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজন প্রভৃতিতে মোট ১৯২ কোটি টাকা খরচ করা হবে, যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৯৬ কোটি টাকা। তিন বছরের মধ্যে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষককে 'সয়েল হেল্‌থ কার্ড' দেবার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

দেশের কয়েকটি জায়গায় 'সয়েল হেল্‌থ কার্ড' প্রকল্প আগে থেকে চালু থাকলেও একে কখনওই একটা জাতীয় আন্দোলনের চেহারা দেবার কথা ভাবা হয়নি। কৃষিক্ষেত্রের সুস্থিত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে এটি অত্যন্ত কার্যকর এক প্রকল্প। এর আওতায়, কোনও কৃষকের জমির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর কৃষককে একটি কার্ড দেওয়া হয়। এটা অনেকটা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হাসপাতাল থেকে দেওয়া কার্ডের মতো। এই কার্ডে মাটির নমুনায় পাওয়া সব উপাদান এবং পরীক্ষায় কোনও দুর্বলতার খোঁজ মিললে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে কৃষক, অন্ধভাবে ইউরিয়া বা অন্য কোনও সার না দিয়ে, জমির দুর্বলতা কাটাতে যা করা উচিত, তা করতে পারেন। তাঁর খরচ তো বাঁচেই, জমির স্বাস্থ্যও পুনরুদ্ধার হয়, এমনকী তাঁর জমিতে কোন ফসলের চাষ করা উচিত, কৃষক তাও বুঝতে পারেন।

(৩) **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা :** প্রতিটি কৃষকের জমিতে সেচের সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং জলের দক্ষ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের জন্য চলতি বছরের বাজেটে ৫৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছরে বরাদ্দ ছিল ৫৬২৩ কোটি টাকা। বিজেপি-র নির্বাচনি প্রচারে অন্যতম মূল প্রতিশ্রুতি ছিল এই যোজনা, ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী জেটলি এ জন্য ১০০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছিলেন, তবে তখন এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি। গত ২ জুলাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে এটি অনুমোদিত হয়। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০—এই পাঁচ বছরে প্রকল্পের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই প্রকল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে একটি তথ্যই যথেষ্ট। দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ আসে সেচসেবিত কৃষি থেকে। ১৯৯৭-৯৮ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কৃষিজমির মাত্র ৪০.৫ শতাংশ সেচের আওতায় ছিল। জলসেচের বিপুল গুরুত্ব সত্ত্বেও একের পর এক সরকার একে অবহেলা করে এসেছে। ২০০০-০১ থেকে ২০১১-১২ সময়সীমায় সেচসেবিত জমির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৫.৮ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুসারে, এই সময়কালে নেট বীজরোপিত এলাকার সাপেক্ষে নেট সেচসেবিত এলাকার হার ৪০.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৬.৩৪ শতাংশ হয়েছে (সূত্র : পরিকল্পনা কমিশন)।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির নোটে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার প্রধান উদ্দেশ্য হল, তৃণমূল স্তরে জলসেচের জন্য বিনিয়োগগুলির সমন্বয়সাধন, সুনিশ্চিত জলসেচের আওতায় থাকা কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি (প্রতি খেতে জল), জলের অপচয় কমিয়ে তার সুদক্ষ ব্যবহার, জল সংরক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহার ('মোর ক্রপ পার ড্রপ'), সুস্থিত জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন, শহরতলিতে চাষের ক্ষেত্রে পুরসভার সরবরাহ করা ব্যবহৃত জল শোধন করে তার পুনর্ব্যবহার এবং জলসেচের জন্য আরও বেশি করে বেসরকারি বিনিয়োগের পথ সুগম করা। অর্থাৎ এর মূল উদ্দেশ্য হল, তিনটি জলসেচ প্রকল্পকে এক ছাতার তলায় এনে জলসেচ সংক্রান্ত ব্যয়ের বিকেন্দ্রীকরণ। কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং বৈঠকের পর বলেছেন, 'এছাড়া এর উদ্দেশ্য হল জল সৃষ্টি, ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত মন্ত্রক, দপ্তর, সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি অভিন্ন মঞ্চে আনা, যাতে সম্পূর্ণ 'জলচক্রের' একটি সার্বিক ছবি পাওয়া যায়। তাহলে গৃহস্থালি, কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পের জন্য সঠিক জল সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।'

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার পাশাপাশি নাবার্ড জলসেচের জন্য কৃষকদের আগামী তিন বছরে ৩০,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি বছরে ইতিমধ্যেই এ বাবদ ১০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৪) **মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল :** পেঁয়াজ ও আলুর দামের ব্যাপক ওঠানামা বেশ কিছু বছর ধরেই কৃষকদের বিপদে ফেলছে। এগুলি দ্রুত পচনশীল। যথাযথ মজুত ব্যবস্থার অভাবের সুযোগ নিয়ে মুনাফাবাজরা প্রায়শই এগুলির দাম আকাশছোঁয়া করে তোলে। এর ফলে একদিকে কৃষকরা জলের দামে তাঁদের ফসল বেচে দিতে বাধ্য হন, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগীরা মুনাফা লুঠতে থাকে। এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে মোদী সরকার ৫০০

সারণি-১
জলসেচের জন্য বরাদ্দ

পরিকল্পনা	সময়কাল	রাজ্যভিত্তিক পরিকল্পনার সাপেক্ষে জলসেচের জন্য বরাদ্দের হার (শতাংশে)
পঞ্চম	১৯৭৪-৭৮	২৩.২৫
ষষ্ঠ	১৯৮০-৮৫	২০.৮৫
সপ্তম	১৯৮৫-৯০	১১.৮৫
অষ্টম	১৯৯২-৯৭	১৮.৪৮
নবম	১৯৯৭-২০০২	১৪.৯৩

সূত্র : পরিকল্পনা কমিশন

সারণি-২
কৃষি-সংক্রান্ত বিমা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	সূচনাবর্ষ	সমাপ্তিবর্ষ	বৈশিষ্ট্য	ব্যর্থতার কারণ
সার্বিক শস্যবিমা প্রকল্প (CCIS)	প্রযোজ্য নয়	১৯৯৭	গ্যারান্টি দেওয়া ফসলের থেকে উৎপাদন কম হলে কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবেন।	সারা দেশে মোট ক্ষতিপূরণের দাবি ছিল ১৬২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে গুজরাট একাই একটিমাত্র শস্য, বাদামের জন্য পেয়েছিল ৭৯২ কোটি টাকা।
গবেষণামূলক শস্যবিমা	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৭-৯৮	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নির্বাচিত কিছু জেলায় নির্দিষ্ট কয়েকটি ফসলের চাষ করে ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিমার সুবিধা পাবেন। বিমামাশুলে ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল।	বিমামাশুল সংগ্রহ করা হয়েছিল ৩ কোটি টাকার আশপাশে। ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা।
কৃষি আয় বিমা প্রকল্প	২০০৩-০৪	২০০৩-০৪	ফসল ও আয়ের ওপর বিমার সুবিধা একই পলিসি থেকে পাওয়া যেত।	সরকার পরিবর্তন।
জাতীয় কৃষিবিমা প্রকল্প	১৯৯৯-২০০০	এখনও চালু	সব খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, উদ্যানজাত ও বাণিজ্যিক ফসল এর আওতায়। ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ নেননি—দুধরনের কৃষকই এই বিমার সুবিধা পাবেন।	প্রযোজ্য নয়।

কোটি টাকার একটি মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল গঠন করেছে। এই তহবিলের আওতায় ভবিষ্যতে অন্য পচনশীল কৃষিপণ্যগুলিকেও নিয়ে আসা হবে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে, এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের খেত থেকে ফসল কিনে ন্যায্য দামে তা গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হবে।

কৃষিমন্ত্রকের অধীনে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গঠিত কৃষি ব্যবসায়িক কনসোর্টিয়ামও একই লক্ষ্যে কাজ করছে। এই দপ্তরকে দেশজুড়ে কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে এই শাখার উদ্যোগে দিল্লি কিষাণ মান্ডি গড়ে তোলা হয়। এখানে ক্রেতারা সরাসরি কৃষকদের দোরগোড়ায় আসেন। স্থাপনের এক বছরের মধ্যেই দিল্লি কিষাণ মান্ডি, বিভিন্ন কৃষক উৎপাদক সংস্থার মাধ্যমে ১০০০ টনেরও বেশি ফসল বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে।

(৫) **কৃষিঋণ :** সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা দিল্লির প্রতিটি সরকারের কাছেই অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। স্থানীয় মহাজনদের ঋণের ফাঁদে পড়ে কৃষকদের আত্মহত্যার খবর প্রায়শই আমাদের কানে আসে। কঠিন এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে সরকার কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে সাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা করেছে।

(৬) **ডিডি কিষাণ-এর সূচনা :** বিভিন্ন নতুন সম্ভাবনা, আবিষ্কার ও আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর কৃষকদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছোয় না। এই খামতি দূর করতে সরকার, শুধুমাত্র কৃষকদের চাহিদার কথা ভেবে একটি নতুন চ্যানেলের সূচনা করেছে। নজিরবিহীন এই উদ্যোগ তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে বিশেষ সহায়ক হবে।

(৭) **শস্যবিমা :** সরকার একটি নতুন কৃষিবিমা প্রকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে বলে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি চলতি বছরের ১২ জুলাই জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই বিমার আওতায় কৃষিকাজে ব্যবহৃত যাবতীয় উপাদান এবং কৃষকের নেওয়া ঋণ থাকবে। জেটলি বলেছেন, 'এটি একটি কার্যকর বিমা প্রকল্প। কোনও কারণে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হলে কৃষক এই বিমা থেকে অন্তত পক্ষে তাঁর ব্যবহৃত উপাদানের খরচটুকু তুলে নিতে পারবেন।' সরকার যদি কৃষকদের ঋণদানের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সফল হয়, তাহলে তা গ্রামীণ ভারতে এক শক্তপোক্ত সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো স্থাপন করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এ যাবৎ এই ধরনের সবকটি প্রকল্পই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এইচআর খান বলেছেন, "জাতীয় বিমা ও সংশোধিত জাতীয় বিমার পর এখন আমরা আবহাওয়াভিত্তিক বিমার দিকে এগোচ্ছি। কৃষকদের জন্য আয় সংক্রান্ত বিমা চালু করার বিষয়েও কথা হচ্ছে।"

(৮) **মজুতকরণ :** ফসল মজুতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদামের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝে মোদী সরকার তার প্রথম বাজেটে এ বাবদ ৫০০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছিল। ইনস্টিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুসারে, পর্যাপ্ত গুদাম না থাকায় ভারতে প্রতি বছর ২ কোটি টনেরও বেশি গম নষ্ট হয়, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ। ফল ও শাকসবজির ক্ষেত্রে এই হার ৪০ শতাংশ। সব মিলিয়ে, প্রতি বছর আমরা ৪৪০০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট করি। গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে নাবার্ড ৯ লক্ষ ২৩ হাজার টন শস্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে মজুতের স্থান তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে জলসম্পদ, জমি উন্নয়ন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, খামার, ডেয়ারি, মুরগিপালন, মৎস্যচাষের মতো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে নাবার্ড ৪৭,৭৫৬ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়ার কথা ভাবছে। ২০১৪-১৫ সালে এই পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার কোটি টাকার সামান্য বেশি। অর্থাৎ, সরকার, ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার এই জ্বলন্ত সমস্যা অনুধাবন করে একে দূর করার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

গত এক বছরে শুরু হওয়া এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক দশকের হৃত জমি আবার ফিরে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সরকার শক্তিক্ষেত্রে সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাও গ্রামীণ ভারতকে অনেকটা সহায়তা জোগাবে।

প্রাচীনকাল থেকে একটা ধারণা আছে যে, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমা প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কার্যালয়গুলির তথ্য এবং সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত সমীক্ষা এই ধারণার বিপক্ষে যাচ্ছে।

আসলে আমাদের দেশে কৃষি ক্রমশই গ্রামীণ পরিবারগুলির ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামীণ যুবসম্প্রদায় এর হাত থেকে বাঁচতে শহরে ছুটে যাচ্ছে। তাতে কেবল বস্তি এলাকার জনসংখ্যা বাড়ছে, গভীরতর হচ্ছে কাঠামোগত সমস্যা। এনডিএ সরকারের চালু করা প্রকল্পগুলি সাফল্যমণ্ডিত হলে এই প্রবণতা বিপরীতমুখী হবে, রূপ নেবে সার্বিক বিকাশের স্বপ্ন। ❑

[লেখক অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা করেন, বর্তমানে NCDEX-এর সঙ্গে যুক্ত।
email : bhaskarbhuwan@gmail.com]

New Horizon Publication of Tojammel Hossain

1/1 Shambu Chatterjee Street, Kolkata - 7
Mb: 9836484969, 9831050754

তুজামমেল হোসেন প্রণীত বইগুলি WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা

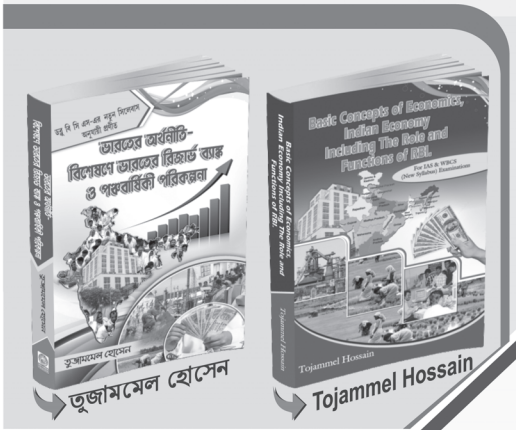

WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষার ধরনধারণ ও সিলেবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হল বই দুটি। এই বই দুটি একসাথে অধ্যয়ন করলে WBCS সহ যে কোন চাকরির পরীক্ষার অর্থনীতি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হবে।

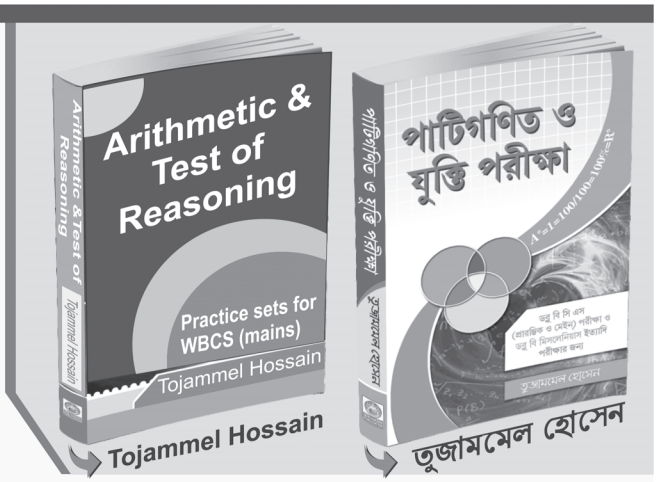

সম্প্রতি বাংলা মাধ্যমের বইটির সাথে English মাধ্যমের বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সর্বাধুনিক Short-Cut Methods and Tips ব্যবহার করে WBCS এর উপযোগী সমস্ত G.I. & Arithmetic উপস্থাপন করা হয়েছে এইবই দুটিতে।

WBCS এর পূর্বতন (Preli & Mains) পরীক্ষার যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে এবং পরীক্ষার উপযোগী যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হয়েছে খুব সহজ পদ্ধতিতে।
G.I শেখার জন্য যেসব Aljebra ও অন্যান্য Mathematical Instruments প্রয়োজন তা খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মূল বইটিতে, যার কোন বিকল্প নাই।

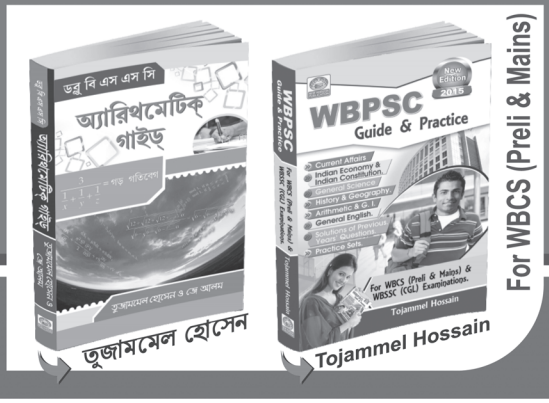

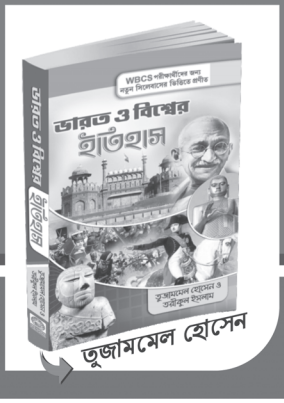

WBCS -এর Optional & Compulsory পরীক্ষার উপযোগী।

ভারতে কর্মসংস্থান ও সার্বিক বিকাশ

উদ্ভূত ধরন ও প্রেক্ষাপট

আর্থিক বিকাশই জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি নয়। দেশের সর্বত্র আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে প্রয়োজন প্রত্যেক নাগরিককে তার নিজস্ব কর্মক্ষমতার বিকাশ করে উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্য অধরাই থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্পের কথা আলোচনা করছেন **অধ্যাপক অলখ এন. শর্মা।**

১৯৯০-এর গোড়ার দিক থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিন দশক কালে বা ওই রকম সময়ে ভারত বছরে ৬ শতাংশেরও বেশি উচ্চ বার্ষিক বিকাশ হার লাভ করেছে। তবে এর পরের দু'বছরে বিকাশ হার এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার অনেকটাই কমে আসে আন্তর্জাতিক এবং সেই সঙ্গে দেশীয় নানা কারণে। তবে এখন মনে হয় অর্থনীতি আবার বেশ ভালোভাবেই পুনরুজ্জীবনের পথে এবং বিকাশ হারও বাড়ার ইঙ্গিত দেখিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় হিসাব তৈরির নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত এখন চীনকে টপকে যে কিনা ইতিমধ্যেই মন্দার মুখে পড়েছে, বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮০-র দশকের প্রায় ২.৫ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ১.৫ শতাংশে দাঁড়ানোয় এই বিকাশ হারের বৃদ্ধিতে দেশের মাথাপিছু আয় ধারাবাহিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এর ফলে একদিকে যেমন দারিদ্রের ক্ষেত্রে যথেষ্টই হ্রাস ঘটেছে আর সেই সঙ্গে ভালো থাকার অন্যান্য সূচকগুলি যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতিরও উন্নতি ঘটেছে। তবে এই সব কৃতিত্ব সত্ত্বেও দারিদ্র কিন্তু এখনও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আর কর্মসংস্থানও আনুষ্ঠানিকতার প্রভাবমুক্ত হওয়াটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের তুলনায় মন্থর গতিতে বাড়ছে। এই সব পছন্দ না হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোকপাত করা দরকার।

কর্মসংস্থানের অসংগঠিত দশা, কর্মরত গরিব এবং বাদ পড়ে থাকা

ভারত পৃথিবীর সেই সব দেশের মধ্যে রয়েছে যেখানে কর্মীবলের অসংগঠিত দশাটা সবথেকে বেশি প্রকট—২০১১-১২ অর্থবর্ষে মোট শ্রমবলের মাত্র ১৮ শতাংশেরই নিয়মিত কাজ ছিল সংগঠিত ক্ষেত্রে। আর তার মধ্যে মাত্র ৭.৫ শতাংশের হাতে সামাজিক সুরক্ষা-সহ সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান ছিল। গত কয়েক বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রেও অসংগঠিত কর্মী যেমন ঠিকা ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের ভাগটা বেড়ে চলেছে। আর এটা এখন ৫৮ শতাংশের মতো। গত কয়েক বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রেও অসংগঠিত অর্থাৎ ঠিকা ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের আনুপাতিক হারটা বেড়েই চলেছে। আর এটা এখন প্রায় ৫৮ শতাংশের মতো। সামাজিক সুরক্ষার বেষ্টনী না থাকাটাই শুধু নয়, এসব অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই উপার্জন খুব কম। আর শ্রম উৎপাদনশীলতাও নীচের দিকে। যদিও দারিদ্রের হার কমেছে তবুও এর মাত্রাটা এখনও মেনে না নেওয়ার মতোই যথেষ্ট বেশি। ভারতের শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিবেদন (ইনস্টিটিউ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট) ২০১৪-তে দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান সরকারি দারিদ্র রেখা অনুসারে (১.২৫ ডলার পিপিপি-র সমতুল), ভারতীয় শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশই হল গরিব। আর যদি বর্তমান দারিদ্র রেখাটাকে বাড়িয়ে প্রায় ২ ডলারে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে শ্রমিকদের প্রায় ৫৮ শতাংশই গরিব থেকে যাবে। অন্যদিকে, দেশের সার্বিক উন্মুক্ত কর্মসংস্থানের হার মাত্রই ৩ শতাংশ আর যদি দৈনিক মজুরির ভিত্তিটা ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬ শতাংশে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেকারত্ব বা কর্মহীনতা থেকেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ শ্রমিকের করা উপার্জনটা তাদের কর্মরত দরিদ্র করে তুলেছে, যেটা হল সমস্যার মূল কথা।

আরও কয়েকটা জরুরি বিষয় আছে যেগুলি ইঙ্গিত করে যে ভারতের উচ্চ বিকাশ হারটা সকলকে শামিল করে ছিল না। প্রথমত দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে সংগঠিত ক্ষেত্রে ভালো কর্মসংস্থানের ঘনত্বটা বেশি হওয়া। দেশের মধ্যে ও পূর্বাঞ্চলে যেখানে উপজাতীয় এবং অন্যান্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলির ঘনত্ব অনেক বেশি এবং মোট জনসংখ্যার এটা প্রায় ৪৮ শতাংশ, তারা দেশের মোট সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রের চাকরির মাত্র ২৭ শতাংশের অধিকারী। অন্যদিকে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ মানুষের বাস, তারা সমস্ত বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্মিলিত চাকরির প্রায় তিন-চতুর্থাংশের অধিকারী। উচ্চ বিকাশ প্রক্রিয়ায় অঞ্চলগত এই বাদ পড়াটা সত্যিই গভীর উদ্বেগের বিষয়।

কর্মসংস্থানে মেয়েদের সুযোগ পাওয়ার বৈষম্য এবং শ্রম বাজারে বৈষম্যটা আরেকটা চ্যালেঞ্জের জায়গা। মহিলা শ্রমিকরা তাদের

পুরুষ সঙ্গীদের তুলনায় অনেক বেশি হারেই কম উৎপাদনশীল ও কম বেতনদায়ী কাজকর্মে যুক্ত থাকে। শিক্ষাগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাড়তে থাকা আয়ের প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত প্রভাবের দরুন কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার কমে আসার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আর সেটা হল তাদের জন্য সঠিক কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব। মেয়েদের শিক্ষাগত সুযোগ লাভের হার বাড়ার ফলে আগামীদিনে শিক্ষিত মহিলার সংখ্যায় অনেক বড় মাপের পরিবর্তন দেখা যাবে। দেশে এখন শিক্ষিত তরুণীদের বেকারত্বের হার ২৩ শতাংশ, যেটা পুরুষদের সংশ্লিষ্ট হারের দ্বিগুণ। তাই ক্রমশ বাড়তে থাকা তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির চ্যালেঞ্জটা আগামীদিনে খুব তীক্ষ্ণ হারে বাড়বে আর সেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে হবে অনেক বেশি চাপের। কেননা তারা বেশিরভাগ পুরুষের মতো কাজের খোঁজে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়তে পারবে না সমাজের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দরুন।

সমস্যাটার মোকাবিলা

এইভাবে ভারত যদিও চরম দারিদ্র কমানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, অবশ্যই যেটা কেবলমাত্র টিকে থাকার পর্যায়েই, এ দেশ এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন সফল নয়। কর্মসংস্থান-নিবিড় সার্বিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত কৌশল ও নীতির উদ্ভবটাই হল দেশের সামনে একটা অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ। কর্মহীনতা, অনুপযুক্ত মানের কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র এই তিনটিকে আক্রমণ করতে হলে ধারাবাহিক বিকাশটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু একই সঙ্গে এটাই আদৌ যথেষ্ট নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল বিকাশ প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস এবং নতুন করে কাঠামোয় বেঁধে ফেলা। এই ক্ষেত্রে মুদ্রা ও আর্থিক নীতির সঙ্গে সমন্বয় করে উপযুক্ত ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের ম্যাক্রো অর্থনৈতিক এবং আথিক নীতির মধ্যে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যটাকেও শামিল করতে হবে। একইভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকেও উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং উৎসাহসূচক অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা এই সব নীতির বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে নজর দিতে হবে। বাজার চালিত বিকাশ প্রক্রিয়া নিজে থেকেই যে এই সব অসাম্য দূর করে দেবে, এমনটা ভাবা আদৌ ঠিক হবে না। এর জন্য রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ ও উপযুক্ত ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল নিয়ে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে। শ্রমিকদের কম উপার্জন এবং খারাপ উৎপাদনশীলতার নেপথ্যে দেশের শিক্ষার নীচু ও নিকৃষ্টমান তাও একটা জরুরি শর্ত। আর তাই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানব সম্পদ বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মমুখী দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের দিকে বিরাট হারে বিনিয়োগ খুব জরুরি। অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি পরিকাঠামোগত দিক থেকে রীতিমতো পিছিয়ে রয়েছে। তাই অসুবিধাগ্রস্ত অঞ্চলগুলির জন্য উপযুক্ত যত্ন নেওয়া যাতে করে সেখানে ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, সেটা মাথায় রেখে বিকাশ প্রক্রিয়ার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন। এটা শুধু যে বাদ পড়া, বন্ধ করা এবং কর্মসংস্থান তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, কিন্তু বিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যও বটে।

বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচির ভূমিকা

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারত বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু বিশেষ কর্মসংস্থান সঞ্চারমূলক এবং দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যাতে সমাজের বিপন্ন অংশের মানুষ যারা বিকাশ প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে গেছে, তাদের যত্ন নেওয়া যায়। এই সব বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট প্রকল্পকে দুটো বড় মাপের শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল স্বনিযুক্তি প্রকল্প আর অন্যটা মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প।

ক) স্বনিযুক্তি প্রকল্প : ১৯৯৯ সালে সব গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রকল্পকে একত্রিত করে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) চালু হয়। এই SGSY ব্যাংক ঋণ এবং সরকারি ভরতুকির সংমিশ্রণের মাধ্যমে আয় সঞ্চারকারী সম্পদ সৃষ্টির জন্য সহায়তা জুগিয়ে অণু বা অতি-ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার উপর নজর দিয়েছিল। এটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও তাদের সক্ষমতা জোগানের মাধ্যমে সামাজিক গতিসাধনের ওপর জোর দিয়েছিল। এই সঙ্গেও এটা আরও বেশ কিছু দিক যুক্ত করেছিল, যার মধ্যে আছে সক্রিয়তা সংক্রান্ত গুচ্ছ তৈরির পরিকল্পনা, পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির নির্মিতি, প্রশিক্ষণ ও বিপণন আর সেই সঙ্গে সমাজের দুর্বলতর অংশের উন্নয়নে যোগ দেওয়া।

SGSY-র আওতায় স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা পাওয়া গেল তা থেকে দেখা গেল যে, গরিবদের পরিবারে এখানে শিক্ষার মান বলার মতো নয় অথবা খুবই কম, সহায় সম্পদ অত্যন্ত ন্যূন এবং কেবল মরশুমি স্বল্প মাত্রার মজুরি সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়, সেখানে স্বনিযুক্তির দিকে যাওয়ার প্রধান বাধাগুলির মধ্যে শুধু যে পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের অভাব তাই নয়, সেই সঙ্গে দক্ষতা ও সামর্থ্য এবং ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তারও অভাব থাকে।

SGSY-র সীমাবদ্ধতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার ওই প্রকল্পটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তার নাম দিল জাতীয় গ্রামীণ জীবনযাত্রা অভিযান, যাকে পরবর্তীকালে নতুন করে নামকরণ করা হয় আজীবিকা অর্থাৎ জীবনযাপনের জন্য জীবিকা। আর এটি ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। আজীবিকা গরিবদের জন্য বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গড়ে তোলার ওপর নজর দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এবং গ্রাম, ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে তাদের সংঘ এবং জীবিকার সম্মিলনী গড়ে তোলা। এটা প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলিকে শামিল করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে তাদের আরও বড় আকারে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্য নেয়। প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশকে এই সঙ্গেই নতুন করে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সরকার এই সঙ্গেই একটি ঋণ নির্ভর কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করে ২০০৮-র আগস্টে, যার নাম প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সঞ্চার প্রকল্প (PMEGP)। গ্রাম ও শহরে স্বনিযুক্তির সুযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু হয়। এই স্বনিযুক্তি প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ

দিক হল উদ্যোক্তা বিকাশ। তবে এর মূল্যায়নে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পে ঋণের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা বড় ফাঁক থেকে গেছে।

সব মিলিয়ে এইসব স্বনিযুক্তির প্রকল্পগুলির মানুষের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের ওপর খুব সীমাবদ্ধ প্রভাব দেখা গিয়েছিল আর এক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণটা এই সব সহায়তা যারা খোঁজে তাদের মোট প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে প্রতিভাত হয়। এছাড়া সুবিধাভোগী কিছু পরিমাণটাও অত্যন্ত কম একমাত্র PMEGP ছাড়া। এই সব কর্মসূচিগুলির খারাপ কাজকর্মের জন্য ব্যাংক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর দীর্ঘসূত্রতাই দায়ী বলে মনে করা হয়। যেই যেই জায়গায় এইসব অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠা গেছে সেখানে ফলাফল অনেক ভালো হয়েছে, ঠিক যেমন কেরলের কুদুম্বাশ্রী ও অন্ধ্রপ্রদেশের স্বনির্ভর গোষ্ঠী কর্মসূচি।

খ) মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প : গ্রামাঞ্চলে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় একটা বড় বিবর্তন দেখা দিল, যখন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (MGNREGA) ২০০৫ সালে শুরু করা হল। এই আইন একশো দিনের মজুরি ভিত্তিক কর্মসূচির গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রদান করল দেশের সব অংশের গ্রামীণ এলাকার মানুষজনকে এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের আইনি বৈধতারও নিশ্চয়তা দিল। এছাড়াও এটি গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের জীবিকার জন্য সম্পদ গড়ে তোলা এবং গ্রামীণ জীবিকা সংক্রান্ত সম্পদ সৃষ্টির দিকেও লক্ষ দিল। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি যে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব পেল, সেটা পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়নের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ বলে গণ্য হল। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত শ্রেণির যেমন কিনা মহিলা ও দলিতদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে গ্রামীণ জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে চালিত করে তাদের অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ বলে পরিগণিত হতে লাগল। এই প্রকল্পের নানা ধরনের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে এটি গ্রামাঞ্চলের বাড়িঘরের মজুরি ভিত্তিক আয়ে যথেষ্ট উন্নতি তো ঘটিয়েছেই, আর সেই সঙ্গে বিপদে পড়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র যাওয়ার প্রবণতাও দিয়েছে কমিয়ে। স্বনির্বাচনের প্রকল্প হিসেবে MGNREGA এক ব্যাপক শ্রেণির শ্রমিকের কাছে পৌঁছচ্ছে। যাদের মধ্যে রয়েছে ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তীয় চাষি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত অংশের মানুষ। এই সব গোষ্ঠীগুলি দারিদ্র এবং বঞ্চনার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি বিপন্ন আর এই প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ তাদের কর্মসংস্থানই শুধু নয়, জীবনযাত্রার শর্ত উন্নয়নেও রীতিমতো সহায়তা করেছে।

যদিও এই প্রকল্পে আঞ্চলিক স্তরে বৈষম্য আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে MGNREGA-র কাজের জন্য খুব বেশি রকমের চাহিদা লক্ষ করা গেছে। প্রকল্পে যেমন বলা আছে, প্রায়শই শ্রমিকরা কিন্তু একশো দিনের কাজের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। আর স্থানীয় স্বশাসনমূলক ব্যবস্থাগুলিকে কাজের জোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা কারণে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই সব কারণের মধ্যে যেমন রয়েছে, কারিগরি সামর্থ্যের অভাব, তেমনি দেখা যাচ্ছে পরিচালনগত দুর্বলতা। যাই হোক, এই প্রকল্পে পাওয়া কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিয়মানুবর্তিতা, ধারাবাহিকতা এবং পূর্বাভাস যোগ্যতার দিকেই নজর রাখে। অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে যেখানে MGNREGA-র কাজকে অপ্রতুল কৃষির মরশুমে সংস্থান করার মাধ্যমে কাজের নিয়মানুবর্তিতা এবং দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে এই কাজ সুনিশ্চিত করা হয়। সেখানে এই প্রকল্পের কাজকর্ম সেইসব রাজ্য থেকে ভালো হয় যেখানে এই সব দিকগুলিতে নজর দেওয়া হয় না। এই সব ব্যবস্থা শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্মসংস্থানের বর্ষপঞ্জিকে প্রয়োজন অনুসারে রদবদল করে নেওয়ার সুবিধা দেয়, যাতে তারা কৃষিকাজ এবং সরকারি কাজ দু'দিক থেকেই সব থেকে বেশি সুবিধা পেতে পারে। আর যাই হোক, বিহার এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে আবার এখনও MGNREGA-র কাজ আর কৃষি মরশুমের কাজ একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়ায় প্রায়ই কাজের দিনের সংখ্যাগত অভাব চোখে পড়ে, যার ফলে শ্রমিকরা অপ্রতুল কৃষির মরশুমে কাজের খোঁজে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলির সামর্থ্যের অভাব আর এর সঙ্গে জড়িত কর্মীদের অভাব এবং কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদের সংখ্যাল্পতা প্রায়শই নানা রাজ্যে MGNREGA-র খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী প্রধান কারণগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়। আর বিশেষ করে এটা বেশি দেখা যায় উত্তর ভারতেই। এও দেখানো হয়েছে যে, এই কর্মসূচিতে সম্পদ গড়ে তোলার দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না। আর সেই সঙ্গে বেঁধে দেওয়া খরচ মেটানোর লক্ষ্যটাকেই কেবলমাত্র অনুসরণ করা হয়। যাইহোক, এই সব সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকেই এই কর্মসূচিটি তার পূর্বসূরিদের সকলের থেকেই অনেক বেশি সফল। তবে সেই সঙ্গে এটাও অনুভূত হয়েছে যে, এই কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়, যদি না এটিকে অন্যান্য চালু উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয় কর্মমুখী দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি-সহ।

শহরাঞ্চলের কর্মহীনদের অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মাত্রার কাজে নিযুক্তদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে খুব অল্পই দারিদ্র দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প আছে। যেগুলি সত্যি সত্যি স্বনিযুক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করে অথবা মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান বাড়ায়। স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJRY)-এর দুটি প্রধান অংশ আছে, এর একটি শহরাঞ্চলের স্বনিযুক্তি প্রকল্প আর অন্যটি শহরাঞ্চলের মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প। আর এই দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শহরাঞ্চলের স্বনিযুক্তি প্রকল্প অনুসারে শহরের গরিবদের নিজ নিজ উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়। আর শহরাঞ্চলের মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্পে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থায় নিজের ক্ষমতার মধ্যে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় সরকারি সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে। এই পর্যন্ত অবশ্য

এই প্রকল্পটি শহরাঞ্চলের বেকার ও নীচু মানের কাজকর্মে যুক্ত মানুষজনের সুবিধা জোগানোর ক্ষেত্রে তেমন লক্ষণীয় ভূমিকা নিতে চোখে পড়েনি। প্রতিষ্ঠানগত এবং রূপায়ণগত বাধা ছাড়াও এই ব্যর্থতার আরেকটা প্রধান হল এর আওতার সীমাবদ্ধতা।

বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলির সার্বিক মূল্যায়ন

প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলির সার্বিক কাজকর্মের মূল্যায়ন থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে MGNREGA ছাড়া অন্য সব প্রকল্পগুলির প্রভাবটা খুবই সীমাবদ্ধ। প্রধানত তাদের কাজের আওতার স্বল্পতার জন্য, কেননা MGNREGA-র সার্বজনীন প্রকৃতি, আপনা থেকেই এর আওতা এবং প্রভাব দুই-ই বাড়িয়েছে। এই সীমাবদ্ধ প্রভাবের নেপথ্যে আর যেসব কারণ দায়ী বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে রয়েছে, রূপায়ণ ব্যবস্থার সামর্থ্যের অভাব, নকশার ত্রুটি, রূপায়ণকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, ফাঁকগুলি থেকে জন্ম নেওয়া দুর্নীতি, সুবিধাভোগীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে তালমিলের একান্ত অভাব। সে যাই হোক, এই সব কর্মসূচিগুলির প্রভাব অঞ্চলভেদে লক্ষণীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সব কর্মসূচিগুলির বেশিরভাগই উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে অনেক ভালো ভাবে রূপায়িত হতে দেখা গেছে।

এক্ষেত্রে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন প্রায়ই উঠে থাকে, যেটা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রকৃত সাম্যের অভাব। এই সব প্রকল্পগুলি দারিদ্রের স্তর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কমা উচিত এবং বিকাশ প্রক্রিয়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম বাজার আরও সংকুচিত হওয়া উচিত এবং এদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে কখনওই দেখা উচিত নয়। যাই হোক, দেশের বিকাশের বর্তমান দশায় যেখানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া দারিদ্র এখনও চোখে পড়ে, সেখানে সেইসব কর্মসূচিগুলিকে অন্তত আগামী পাঁচ বছর বা ওই রকম মেয়াদে চালু রাখার অনেক কারণ আছে। যাতে মেয়াদঅন্তে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা যায়। এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রশ্ন হল এদের আরও কার্যকর করার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে এদের যুক্ত করা, যাতে তারা বিকাশ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে। কড়া নজরদারি ও মূল্যায়ন এই সব কর্মসূচি রূপায়ণ পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত, আর যেখানেই প্রয়োজন তাদের নিয়ন্ত্রণ বা নতুন করে নকশা করার সুবিধা থাকা উচিত।

এই সব কর্মসূচিগুলির কাজকর্মকে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রভাবেই নয়, অর্থনীতি ছাড়া অন্যান্য প্রভাবের দিক থেকেও বিচার করা উচিত। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, তা কার্যকরী চাহিদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলিও এসব কর্মসূচির সাহায্যে অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। MGNREGA-র মতো কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের গরিবদের সংঘবদ্ধ করে তোলায় এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে।

উপসংহার

সামাজিক দিক থেকে সার্বিক বা সকলকে শামিল করার লক্ষ্য অর্জনে শ্রম নিবিড় ও দরিদ্রমুখী বিকাশ কৌশল এবং উন্নতিপ্রাপ্ত এবং পুনর্বিন্যস্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলি অনেকটাই সফল হবে। কিন্তু এই সত্ত্বেও রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রকৃতি এবং বাজারের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকভাবে বিপন্নতা ও বাদ পড়ে যাওয়াটা কমের দিকে থাকলেও বর্তমান থাকবে বলেই আশঙ্কা হয়। আর তাই রাষ্ট্রকে অন্যকিছু কার্যকর ব্যবস্থার সাহায্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এদের মোকাবিলার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম মাত্রার সংস্থান করা, যেটা ওদের বেকারত্ব, অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং ওই জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিকদের মাত্র ১০ শতাংশই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সুরক্ষা পেয়ে থাকেন। আর এদের অধিকাংশই হলেন সংগঠিত ক্ষেত্রের। সাম্প্রতিককালে সরকার বার্ধক্যভাতা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, স্বাস্থ্যবিমা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। এই সব ক্ষেত্রে সুবিধার পরিমাণটা যে নিতান্তই স্বল্পতার পরিণাম তাই নয়, এই সব ক্ষেত্রে প্রধান সীমাবদ্ধতার কারণই হল লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি ও বাদ দেওয়ার ত্রুটি। দারিদ্রসীমার নীচে ও দারিদ্রসীমার ওপরে মানুষদের ভাগ করার ব্যবস্থাটা একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। সেই কারণেই একটি সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, যেটা কিনা খুব সহজেই কিনে নেওয়া যায়, এমন সম্পন্ন গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাকি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ন্যূনতম কিছু মৌলিক সুবিধা জোগানোর ক্ষেত্রে, দেশের মানুষের বিপন্নতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাদ পড়া ঠেকাতে সেই কর্মসূচির অনেক দূর পৌঁছানোর কথা। আর্থ সামাজিক জাতিগত সুমারির ফলাফলকে যে আধার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে ওটাকে জোরদার করতে সেটি অনেকটাই সহায়তা করবে। দেশ গরিব মানুষের জন্য এই ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ জোগাতে যথেষ্টই সমর্থ। আর এটা কেবলমাত্র সকলকে শামিল করা আর ন্যায়বিচার করার জন্য আবশ্যিক নয়। ধারাবাহিক বিকাশ প্রক্রিয়া অর্জনের জন্যও তার গুরুত্ব সমধিক।❑

[লেখক অধ্যাপক ও অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, নতুন দিল্লি।
email : alakh.sharma@ihdindia.org]

উল্লেখপঞ্জি :

IHD (2014), *India Labour and Employment Report 2014*, Institute for Human Development, New Delhi

MORD (2012), *Annual report 2011-12*, Ministry of Rural Development, GoI, New Delhi

Sharma, Alakh N. (2013), *Experiences of National Rural Gaurantee Act in India and Some Aspects of Decent Work Agenda* (mimeo) Institute for Human Development, New Delhi

সার্বিক বিকাশে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ভূমিকা

প্রেক্ষাপট ২০১৫

অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়নের পথ আরও মসৃণ হয়। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না হলে সাধারণ মানুষের উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে কীভাবে? এ ক্ষেত্রে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা অন্যতম। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র আর্থিক বিকাশের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিশাতেও কীভাবে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে আলোচনা করছেন **ড. পি এম ম্যাথিউ।**

এমএসএমই : সদা সর্বদার একটি শামিলকারী সংস্থা

সার্বিক বিকাশ বা সকলকে শামিল করে বিকাশ-এর ধারণাটা বিকাশ বনাম বণ্টন নিয়ে বিশ্বজোড়া যে বিতর্ক আছে তারই অনুষঙ্গ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে যে সহমত গড়ে উঠল তা হল 'বিকাশ আর বণ্টনকে' আলাদা করে দেখার চেয়ে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন যেখানে দুটি দিক একে অপরের সঙ্গে মেলে। এইভাবেই তথাকথিত সার্বিক বা সকলকে শামিল করে বিকাশের বিষয়ে আলোচনাটা এসে পড়ে। বিশ্বজোড়া সহমত আর বাদানুবাদের মাত্রাটা যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে থিতু হচ্ছে বিভিন্ন দেশে যে সব অভ্যাস প্রচলিত তা কিন্তু এক অন্য গল্প শোনায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নিজ নিজ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সার্বিক বা সকলকে শামিল করে বিকাশের তত্ত্ব ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ বোঝাপড়ার মাত্রার তারতম্য হয়।

ভারতে অতি-ক্ষুদ্র বা অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা (এমএসএমই)-এর ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগের রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা সুর আছে। এটা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শুরু হয়েছিল, যখন প্রশাসনের স্বনির্ভর রাজনৈতিক এককগুলি এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা ও বাজারের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির ভূমিকাটা ছিল অনেক স্পষ্ট। অর্থনীতিবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের গড়ে তোলা মডেল অনুযায়ী ভারতের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ক্ষেত্রকে বিকাশের ইঞ্জিন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, যেটা কিন্তু অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সহচরের ভূমিকা পালন করত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে সার্বিক বা সকলকে শামিল করে বিকাশের ধারণাটা গড়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু এই শব্দবন্ধটা অনেক পড়ে ব্যবহার করা শুরু হয়।

সার্বিক বা সকলকে শামিল করে বিকাশের সাধারণ ধ্যান-ধারণাটা যতই এগোতে থাকে, এটাকে চালু রাখার বিষয়ে নানা চ্যালেঞ্জ সেই সঙ্গে দেখা দেয়। এইসব চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের সমাজ ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাটা অনেকটা প্রভাব ফেলে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য শর্ত হল এই বিকাশটা চালিয়ে যাওয়া। ভারতের বিকাশ সংক্রান্ত বিষয় ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উদ্ভূত বিতর্কের একটা অঙ্গই হল এটা বজায় রাখতে পারা যাবে কি না সেই সম্পর্কে বিতর্ক।

গত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিকাশ ও বৈচিত্রীকরণ হারের অনপেক্ষভাবেই বেশ তাৎপর্য ভূমিকা নিয়েছে। বিকাশটা যেখানে কোনও কট্টর অর্থনীতিবিদের চিন্তার বিষয় সেখানে তার ফলটা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পৌঁছুতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করাটা নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ। এই প্রসঙ্গেই সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক দিক থেকে এই অত্যাবশ্যক ভূমিকাটি এমএসএমই-র প্রসঙ্গেই প্রত্যক্ষ করা হয়ে থাকে।

ঐতিহ্যগতভাবে যখন এই সামাজিক ভূমিকাটা এক স্বয়ংক্রিয় পথেই ছাড়া হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তখন সাম্প্রতিক অতীতে পরিস্থিতিটা দ্রুত অনেকটাই পালটে গেল। যখন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, তখন সেই সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতা যেমন থাকে, তেমনই পিছিয়ে পড়াদেরও থাকার কথা। এই পিছিয়ে পড়াদের ফেলে রেখে যাওয়ারই কথা। ওদেরও কীভাবে মূল স্রোতে ঠাঁই করে দেওয়া যাবে? এটাই হল একটা চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন। ভারতীয় অর্থনীতির প্রান্তদেশে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি এখানেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামুদায়িকতা : ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা

সামুদায়িকতা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় কৌশলটা হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এমএসএমই-র বিকাশে ভারতীয় কৌশল এই পর্যন্ত কৌশলগত তিনটি প্রজন্ম পেরিয়ে এসেছে। প্রথমত ছিল সুরক্ষা ও সংরক্ষণের সনাতন কৌশল। এর পর এল আরেকটি কৌশল যেটা অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির খুব কাছাকাছি। তৃতীয়ত, সাম্প্রতিককালে দেশ এখন সামর্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ধরে নেওয়া যায় দেশ তার এমএসএমই ক্ষেত্রকে বিকাশসূচির মূল স্রোতে নিয়ে যেতে পারে।

ভারত সরকারের অতি সাম্প্রতিক নীতিগত ঘোষণায় এর ইঙ্গিত আছে। একদিকে, জাতীয় নীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রয়েছে ফ্ল্যাগশিপ বা দিশারি প্রকল্পগুলি। আর অন্যদিকে, এর অনুষঙ্গ হিসেবে কর্মমুখী দক্ষতা এবং শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সম্মেলন এটা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যে, এ দেশের মানষের সৃজনশীলতা ও শক্তিকে উৎপাদনশীল এবং সামাজিক দিক থেকে অর্থবহ কাজকর্মের মধ্যে বইয়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকার ইদানীং এই অভিমুখে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যাই হোক, এই সব চাহিদার সূক্ষ্মতর দিকগুলিকে কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

নতুন নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বের তাৎপর্য

ভারতে নতুন সরকারি নীতির দৃষ্টিভঙ্গিটা সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় আর দেশের নীতি সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যে বিতর্ক রয়েছে, তার বিরুদ্ধে এটার অনেক তাৎপর্য আছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে সরকারি নীতি প্রণয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চাহিদা, প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগাম অনুমানে ব্যর্থতা, যেটা কিনা যুক্তিসংগতভাবে আগেই বোঝা উচিত ছিল। আর তার ফলেই অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হত। বহির্রঙ্গের পরিবর্তন বা নতুন নতুন তথ্যের জন্য যেসব পরিবর্তনের প্রয়োজন হত তার থেকে অনেক বেশি হারেই নীতি উলটে বা পালটে দেওয়া হত। ভারতের নীতি প্রণয়ন কাঠামোকে সঠিক নীতি প্রণয়নে অপটু বা অসমর্থ বলে আখ্যা দিয়ে সেই বেঠিক নীতিটিকে আঁকড়ে ধরে থাকার দায়ে দুষ্ট বলে আখ্যা দেওয়া হত (আগরওয়াল ও সোমানাথন ২০০৫)।

আগরওয়াল ও সোমানাথনের ভাষ্য অনুসারে (২০০৫) একটি উৎকৃষ্ট নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উচিত এই মাপকাঠিগুলি পূরণ করা :

(১) যে কোনও ক্ষেত্রের সামনের সমস্যা ও বিষয়গুলিকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের সম্মুখীন হতে হবে।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্মিলন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে তথ্যাদি প্রথাবদ্ধভাবে সংগৃহীত হতে হবে এবং নীতি প্রণয়নকারীদের কাছে যাতে তা পৌঁছয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৩) যে কোনও ক্ষেত্রের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে মতের বৈপরীত্যকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ, স্পষ্টীকরণ ও বিবেচনা করতে হবে এবং এর ফলে যারা উপকৃত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের চিহ্নিত করে তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগাম অনুমান করে নিতে হবে।

(৪) যারা প্রভাবিত হতে পারে তাদের সঙ্গে আলোচনার পর উপযুক্ত আইনি কর্তৃত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং এতে যেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষজন জড়িত থাকেন।

(৫) রূপায়ণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের এই প্রক্রিয়ায় প্রথাবদ্ধভাবে শামিল করতে হবে। কিন্তু তাদের প্রক্রিয়ার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়া চলবে না।

(৬) নীতি প্রণয়নকারী এবং/অথবা তাদের উপদেষ্টাদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট উপযুক্তভাবে বিবেচনা এবং সুসংহত করার উপযোগী মেধাগত গভীরতা ও ব্যাপ্তি এবং সেই সঙ্গে সততা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে যাতে তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম নীতি সংক্রান্ত বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন।

দেশে এমএসএমই বিকাশ সংক্রান্ত প্রয়াসের গত ৬ বছরের রেকর্ড বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির অস্তিত্বের জানান দেয়, যার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্র, উপক্ষেত্র ও সামাজিকগোষ্ঠী। তবে এই সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা হল এই যে এই সব কর্মসূচির সুফলগুলি যেসব প্রাপকের কাছে যেভাবে এবং যে সময়ে পৌঁছুবে বলে মনে করা হয়েছিল, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে সেভাবে পৌঁছয়নি। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এ ক্ষেত্রে দুটো বাধ্যতা থাকে। প্রথমত কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে একটা সুসংহত দৃষ্টি থাকা দরকার। এ ছাড়া এই সব কর্মসূচির প্রকৃত সুফল পৌঁছে দেওয়ার ওপর নজরটাকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়, যাতে কোথাও কোনও ছিদ্র না থাকে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় বাজেটে দেওয়া ইঙ্গিতের ভিত্তিতে বলা যায়, যে কয়েকটা জরুরি পদক্ষেপ রয়েছে, যেগুলিকে আরও ভালো করে পরীক্ষা করা এবং খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার।

সূচনার ওপর বিশেষ নজর

বিশ্বের সর্বত্র যেখানে সূচনার (স্টার্ট-আপ) বিষয়টিকে তুলে ধরার একটা সর্বজনগ্রাহ্য মডেল রয়েছে, ভারতে তার তাৎপর্যপূর্ণ জনসংখ্যাগত সুফলের জন্যই। তরুণদের কেবলমাত্র 'রোজগার' বা 'মজুরি' উপার্জনের জন্য তৈরি করে দেওয়ার বদলে ওদের প্রেরণাগত দক্ষতাকে সুসজ্জিত করার দিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেন্দ্রীয় বাজেট এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে সূচনা ক্ষেত্রে একটা সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দ্বারা এক্ষেত্রে শুভারম্ভ ইতিমধ্যেই ঘটানো হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতের ওপর জোর দেওয়া

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে (ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদনশিল্প) গত দু'দশকে ভারতের পিছিয়ে পড়াটা নীতির দিক থেকে যথেষ্ট নজর কেড়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় প্রস্তুতকরণ নীতি এবং জাতীয় প্রস্তুতকরণ প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি (এনএমসিপি) গ্রহণ করা হয়েছে। দেশকে বিশ্বের প্রস্তুতিকরণ ক্ষেত্রের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট মাইলফলক অর্জনের দিকে এগোনোটা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ভারতের নতুন প্রেক্ষাপটের সূচনা হয়েছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণার দ্বারা। যা ২০১৪-র মে মাসে ঘোষিত হয়েছিল। এরই অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী গত বছর ১৫ আগস্ট স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি নীতি ঘোষণা করেন। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এমএসএমই-কে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রাখা এবং প্রস্তুতিকে ভারতের বলে ছাপ দেওয়া স্বাধীন ভারতে এমএসএমই ক্ষেত্রের নৈতিক আদর্শ ও স্বমর্যাদাকে তুলে ধরার প্রথম প্রয়াস।

কর্মমুখী দক্ষতা সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রধান প্রধান প্রয়াস সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি সব সময়েই গুরুতর সমস্যায় ভুগেছে দক্ষতার ক্ষেত্রে অপ্রতুলতার দরুন। তবে এই সমস্যার সঠিক মাত্রাটা কখনওই উপযুক্তভাবে বোঝা এবং নীতিগত প্রয়াস গ্রহণের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা হয়নি। একেবারে সাম্প্রতিককালের আগে পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কেবল বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাঠামোকে জোরদার করা আর তার জন্য বাড়তি কিছুর ব্যবস্থা করা।

ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক দূরে সরার প্রথম প্রয়াস গৃহীত হল ২০১৪-র কেন্দ্রীয় বাজেটে। ওই বাজেটে কর্মমুখী দক্ষতার দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে দৃষ্টিপাত করা হল। কেবল পর্বগত দক্ষতাই নয়, এটা পর্বগত ও প্রেরণাগত দক্ষতাকে পাশাপাশি রাখার একটা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল। এক্ষেত্রে দিশারি কর্মসূচি 'স্কিল ইন্ডিয়া'-কে যদি সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায়, তাহলে তা দেশের সূচনাকারী (স্টার্ট-আপ) পদক্ষেপ হিসেবে একটা বড় ভূমিকা নেবে।

প্রস্তুতিক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত ও এমএসএমই-র যথাযথ মর্যাদা

আগে যা লক্ষ্য করা গেছে এনএমসিপি ও জাতীয় প্রস্তুতিকরণ নীতি, অবশ্যই দেশে প্রস্তুতির ওপর জোর দেওয়ার সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। সে যাই হোক, কর্মসূচিগুলোকে প্রকল্পে রূপান্তরের সময়কার নজির কিন্তু এ দেশে আদৌ প্রশংসনীয় নয়। অতি সম্প্রতি তিনটি মূল ক্ষেত্রের চিহ্নিতকরণ ও তাদের ওপর গুরুত্বদান তিনটি উপক্ষেত্রের অভিমুখী আরও সমন্বিত প্রয়াসের ইঙ্গিতবহ। এগুলো হল :

(১) প্রতিরক্ষা উৎপাদন;

(২) ইলেকট্রনিক্স;

(৩) বস্ত্রশিল্প।

সামাজিক দিক থেকে প্রান্তীয়-গোষ্ঠীগুলোর সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা

এমএসএমই ক্ষেত্রের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ও একইসঙ্গে সুযোগ হল বহু-সংস্কৃতিবিশিষ্টতা। দেশ হিসেবে ভারত, আরও বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে জাত আর ভাষার গঠনের প্রতিফলন পড়ে উদ্যোগগুচ্ছ গড়ে তোলা আর নিয়োগ কৌশলের ওপর। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকে আসা ভারতের নানা সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষমতায়ন আর শিক্ষাগত স্বীকৃতি অর্জনের ফলে সামাজিকভাবে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীগুলির আরও বেশি করে এমএসএমই-তে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু প্রশ্ন হল এমএসএমই নিজে কতটা প্রস্তুত ওই বৈচিত্র সামাল দিতে? এটা আসলে একইসঙ্গে সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর সরকারি নীতির প্রশ্ন।

তথাকথিত 'সামাজিক প্রান্তীয়তা তত্ত্ব' বলে যে কোনও সমাজের প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীগুলি মূল স্রোতে থাকা জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়। বিশ্বজুড়ে প্রদর্শিত আচরণগত এই ধরনটার ভারতের উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। ভারতে সংবিধান অনুসারে সমাজের প্রান্তবাসীগোষ্ঠীগুলিকে কিছু বিশেষ সুরক্ষা ও সুবিধালাভের যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের গঠন এই সব কার্যকলাপের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। যাই হোক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচিতে সেই সব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং বিশেষ যোগ্যতাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি এ পর্যন্ত কেবল আংশিকভাবেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

একদিকে, যে কোনও সমাজে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মূল স্রোতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে প্রায়শই অসুবিধা হয়। আর তাই তারা অধিকাংশ সময়েই বিশেষ অর্থনৈতিক 'টাইম জোন'-কে বেছে নিতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, বহু দেশেই সংখ্যালঘুদের সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে মূল স্রোতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অঙ্গীভূত করা হয় না। এই সবের পরিণামে বেশিরভাগ দেশেই জনগোষ্ঠীগত এবং অঞ্চলগত সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই স্বচ্ছন্দ থাকতে দেখা যায়। যেমন : ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় বাটিক শিল্প, ভিয়েতনামে মৃৎশিল্প (পটারি), চীনে ইয়ুগুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হস্তশিল্প এবং জামাকাপড় তৈরি, চীনা কাজাখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব (এথনিক) রন্ধন শৈলী প্রভৃতি। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মোরাদাবাদের পিতল শিল্প, নার্জাপুরের লেস তৈরি, চান্নাপত্তনমে কাঠের খেলনা তৈরি আর কর্ণাটকের উডুপি হোটেলগুলি হল তাদের নিজস্ব জনগোষ্ঠীগত ছাপ ও খ্যাতির নজির।

২০১৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সংখ্যালঘুদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিল্পকলা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ উন্নয়নের জন্য একটি কর্মসূচি নিয়ে এসেছিল। এই কর্মসূচিটির নাম শিল্প, সম্পদ ও পণ্যে সনাতনি দক্ষতার উন্নয়ন। বাজেটে এই ঘোষিত এই কর্মসূচিটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প ও হস্তশিল্পের সংরক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছে। দেশের বহু সংস্কৃতিবাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং সংখ্যালঘুদের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা সত্ত্বেও বর্তমান জ্ঞান ব্যবস্থা যা কিনা দেশের নীতি নির্ধারণকে সমর্থন করে এই সব সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা এবং তাকে এই জ্ঞান ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি।

চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

আগে বলা সব পরিবর্তন সত্ত্বেও এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেগুলি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন :

(১) উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের ব্যবহার।

(২) গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে উদ্যোগে মান্যতা দেওয়া।

(৩) সুসংহতভাবে এক বৃহৎ সক্ষমতা গড়ে তোলা।

(৪) সামাজিক চেতনাকে ব্যবসায়িক কোনও ঘটনার সঙ্গে অঙ্গীভূত করা (যথা, সামাজিক উদ্যোগ গড়ে তোলা)।

উন্নয়নের জন্য জ্ঞান

'তথাকথিত উন্নত অর্থনীতিগুলিতে' দ্রুত পরিবর্তনগুলি সাফল্যের নতুন গতিবিদ্যা, নতুন বিধি এবং নতুন চালকের সঙ্গে জড়িত। গত সিকি শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সবথেকে বড় কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে তা হল জ্ঞান অর্থনীতির বিকাশ। গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে জ্ঞানের উত্থান পুরোনো অর্থনীতি আর তথাকথিত নতুন অর্থনীতির মধ্যে বিভাজনের পরিচায়ক। স্টিল, অটোমোবাইল এবং সড়ক ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্প-অর্থনীতি থেকে এই সব দেশ সিলিকন, কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে নির্মিত নতুন অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এটা অর্থনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতক, যেটা এর আগে কৃষি যুগকে শিল্প যুগ দ্বারা প্রতিস্থাপনের মতোই। এই 'নতুন অর্থনীতি' জোগায় ভবিষ্যতের জন্য প্রতিযোগিতা, নতুন উৎপাদন বা পরিষেবা সৃষ্টির সক্ষমতা এবং ব্যবসাকে নতুন সংস্থায় রূপান্তরের সামর্থ্য। এই নতুন সংস্থাগুলি গড়ার কথা এর আগে কিন্তু ভাবা যেত না, অথবা এর পরেও নয়। ততদিনে তারা বাতিলও হয়ে যেতে পারত। কয়েকটা জরুরি কিন্তু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত বিষয় রয়েছে, যেটা নতুন অর্থনীতিকে পুরোনোটার থেকে আলাদা করে দেয়। এগুলি হল :

(১) নলেজ বা জ্ঞান,

(২) ডিজিটাইজেশন,

(৩) ভার্চুয়ালাইজেশন,

(৪) মলিকুলারাইজেশন,

(৫) ইন্টিগ্রেশন/ইন্টারনেট ওয়ার্কিং,

(৬) ডিস-ইন্টারমিডিয়েশন বা মধ্যস্থতার অবসান,

(৭) কনভারজেন্স,

(৮) উদ্ভাবন বা ইনোভেশন,

(৯) প্রোজাম্পশনস বা তাৎক্ষণিকতা,

(১০) বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন,

(১১) ডিসকরডান্স বা অমিল এবং

(১২) স্বনিযুক্তির জোয়ার।

ভারতে এমএসএমই বিকাশ নীতির দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও জ্ঞান সৃষ্টি এবং তাকে এই ক্ষেত্রের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী সঞ্চার করায় আমাদের প্রয়াস বিশ্বমানের অনেক নীচে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিমাণগত বাধা তুলে নেওয়া যেটা এমএসএমই-র ক্ষেত্রে একটা সুরক্ষামূলক কাঠামো হিসেবে ছিল সেটা পরিত্যক্ত হওয়া। যাই হোক, খোলা বাজারের মুখে পড়ে এই ক্ষেত্র কিন্তু তার সুফল পায়নি। উদারীকরণ নীতির সাহায্যে একটা সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র পাওয়ার আশা করা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ফলাফলটা এই ক্ষেত্রের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল না। নীতিগত পর্যায় থেকে কেবল এই তর্ক তোলা হয়েছিল যে, এমএসএমই ক্ষেত্রকে বজায় রাখার মন্ত্র হল উদ্ভাবন। কিন্তু সেই লক্ষ্যে কাজকর্ম ছিল অনেক বাধাবিঘ্নপূর্ণ।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বা নলেজ ইকোনমিতে এমএসএমই ক্ষেত্রকে বজায় রাখাটা একটা একক ক্ষেত্র হিসেবে প্রত্যাশা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে আন্তক্ষেত্রগত যোগাযোগের সুফলটা প্রয়োজন হয়। এখানে উন্নয়ন নির্ভর আমদানি করা প্রযুক্তির পুরোনো ধ্যান-ধারণাগুলির ভূমিকাটা অপেক্ষাকৃত কম। নতুন অর্থনীতিতে পরিসর আর সময় দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। আর এদের স্থানীয় জ্ঞান ব্যবস্থার সাহায্যে সব থেকে সেরাভাবে ব্যবহার করা দরকার। এমএসএমই ক্ষেত্রে জ্ঞান ব্যবস্থায় ভারতের আরও অনেক উন্নয়নের প্রয়োজন। এমন একটা জ্ঞান ব্যবস্থাকে এ ক্ষেত্রে অঙ্গীভূত করা দরকার, যেটা সম্পূর্ণ মূল্যভিত্তিক শৃঙ্খলটাকে শুধু ছুঁয়েই থাকবে না, তাকে পুষ্ট করবে। যাতে সেটা এমএসএমই-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এই পুরোনো পদ্ধতি থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। অবশ্য এমএসএমই-র ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে উদ্যোগকে মান্যতা দেওয়া

ভারতে ঐতিহ্যগতভাবে উদ্যোগ গড়ে তোলাকে ব্যবসায়িক সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসা স্বাভাবিক বলে মনে করা হত। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে অবশ্য এই ধারণার একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়, যেটা সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ বিকাশ কর্মসূচির মাধ্যমে সক্রিয় উদ্যোগ বিকাশ নীতির জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। যদিও এর ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোগ বিকাশকে মূল স্রোতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসটা এর থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তার প্রভাবটা এখনও ঠিকমতো মাপা যায়নি। কেননা এক্ষেত্রে উপযুক্ত মাপকাঠিটা তৈরি হওয়া দরকার। উদ্যোক্তা বিকাশের প্রয়াসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে।

(১) প্রোগ্রাম মডেলিং

(২) প্রোগ্রাম প্রদান (ডেলিভারি)

মূল্যায়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু সমীক্ষা এই দু'ক্ষেত্রেই বাধার ইঙ্গিত দিয়েছে।

দেশের বিশালতার কথা চিন্তা করে এবং এর যুব সমাজের বিরাট সংখ্যার বিবেচনায় উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য উপযুক্ত বোঝাপড়া, পরিমাপ ও পরিকল্পনা গ্রহণে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। এই প্রসঙ্গেই সম্পদের দৃষ্টিভঙ্গিটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। উদ্যোগ হল এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যেটা সংরক্ষণ ও পুষ্টি সাধন করা দরকার। এই বাধ্যতার কথা চিন্তা করে নীতি এবং কৌশলের পূর্ব ইতিহাসটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা উচিত।

সুসংহত সক্ষমতা গড়ে তোলা

সক্ষমতা গড়ে তোলাটা নিজেই হল একটি সুসংহত ধারণা। যে কোনও অর্থনীতিতে শ্রমবাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি যে ব্যাপারে সক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার, তা নির্ধারণ করে দেয়। যাই হোক, তবে সক্ষমতা গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটে যেতে পারে।

আমাদের দেশ বর্তমানে শ্রম বাজারে একটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ গরমিলের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এটা আমাদের সেই বাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশের যুব সমাজকে কর্মমুখী দক্ষতায় সমৃদ্ধ করার কথা বলে। যাতে অর্থনীতির উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রগুলিতে তাদের নিযুক্তি বাড়ানো যায়।

গত বছর স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই জোরল যুক্তিটিই পেশ করেছিলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে 'স্কিল ইন্ডিয়া' নামে এক দিশারি কর্মসূচির ঘোষণা করেন, যেটা দেশের শ্রমবাজার নীতির রূপরেখা দেয়। তবে এমন এক নীতির খুঁটিনাটি ঠিক করা প্রয়োজন। 'এই স্কিল ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে ও আগামী কয়েক বছরে দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রম বলকে নিযুক্তি যোগ্য কর্মমুখী দক্ষতায় সমৃদ্ধ করতে ২০১৪-এর নভেম্বরে কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অন্ত্রপ্রেনরশিপ) গড়ে তোলা হয়।

ভারত যখন নিজেকে জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করে ফেলছে। এ ক্ষেত্রে, বিশেষত এ দেশের যুব সমাজে শক্তি সঞ্চার, প্রেরণা সঞ্চার এবং দক্ষতা সঞ্চার শুধু পরিমাণগতভাবেই নয়, গুণগতভাবেও গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি এবং আদর্শ মানের ক্ষেত্রে আরও অনেক সূক্ষ্মতর কাজ দরকার। এই ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গিগত কৌশল কোনও জাতীয় নীতির পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত। যে নীতিটি ভারতের শ্রম বাজার কর্মসূচির প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশকে অবশ্য বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। ভালো চাকরি পেতে অথবা একজন ভালো শিল্পোদ্যোগী হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মমুখী দক্ষতা অবশ্যই মৌলিক শর্ত। তবে এটাই পর্যাপ্ত নয়। শ্রম বাজারের হস্তক্ষেপ কর্মমুখী দক্ষতার যার একটা প্রধান অঙ্গ, তাকে অবশ্যই চাহিদা-তাড়িত হতে হবে। এদের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও হওয়া দরকার। তাই অন্যান্য জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সামগ্রিক নীতি ও কৌশলের সঙ্গে এদের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। সেই জন্যই কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোক্তা বিকাশের প্রয়াসটা বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টির চাহিদা থেকে আসা উচিত। যেমন,

(১) মজুরি সংক্রান্ত কর্মসংস্থান
(২) স্বনিযুক্তি
(৩) শ্রম রফতানি

মজুরি সংক্রান্ত কর্মসংস্থান বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপার্জন সুনিশ্চিত করে। স্বনিযুক্তি কারও আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আয় ছাড়াও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আর শ্রম রফতানিটা দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারে সম্পদ বাড়ায়। সুসংহত শ্রম বাজার নীতিকে এই তিনটির দিকেই লক্ষ্য দিতে হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। যদিও এই সব ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি কাঠামোগতভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হলেও ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ পরিচালনা করে আর তাই এ ক্ষেত্রে কার্যগত সম্মিলনের প্রয়োজন আছে।

এটা ধরে নেওয়া হয় যে ২০০৫ থেকে ২০১২, এই সাত বছরে দেশে নিট অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ২৭ লক্ষ। দেশে যে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের চাহিদার তুলনায় জোগানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, এটা তার ইঙ্গিত। তাই কর্মপ্রার্থীদের একাংশকে উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে পাঠানো যায় সঠিক অনুপ্রেরণা আর পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে উপযুক্তভাবে অবহিত করে। এ জন্য অবশ্য উপযুক্ত ব্যবসা উন্নয়ন পরিষেবা (বিডিএস)-এর সংস্থান থাকা দরকার, যার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত পরামর্শদানও। কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করে ২০০৯ সালে জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ নীতি রচিত হয়। জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা ও উদ্যোক্তা বিকাশ নীতি ২০১৫ ওই ২০০৯-এর নীতিরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এই নীতির উদ্দেশ্য হল শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের জন্য একটা কাঠামো তৈরি যাতে গতি, আদর্শ (গুণমান) ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। দেশের সর্বত্র কর্মমুখী দক্ষতা সংক্রান্ত কাজ যাতে একই ছাতার মতো কাঠামোর নীচে করা যায়, তার মান ঠিক রাখা এবং তারা যে বাজার-চালিত হবে এটা সুনিশ্চিত করাই এই নীতির উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বেঁধে দিয়ে প্রত্যাশিত ফলাফলের আভাস দেওয়া ছাড়াও ওই ফলাফলে পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজনীয় যানের কাজ যারা করবে সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত করেও দেয় এই নীতি। আসলে, এ ক্ষেত্রে স্বার্থ জড়িত, সেই সব পক্ষ অর্থাৎ সরকার, নিয়োগকারী ও শ্রমিক, সব পক্ষেরই কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার কথা আর, এই ব্যাপারে অসরকারি সংস্থা, গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন, বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট আর সকলে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধানমন্ত্রী 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র দর্শনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে একটা অর্থবহ শ্রম বাজার নীতির কাঠামোর মধ্যে, যেখানে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রক/বিভাগ-এর জাতীয় ও রাজ্য স্তরে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকবে। এই ভূমিকাটা তাদের নিজস্ব দক্ষতা অনুসারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া চাই, যাতে প্রয়াসের দ্বিত্বটা হয় সবচেয়ে কম।

সামাজিক উদ্যোগ

আজ যে কোনও দায়িত্বশীল ব্যবসায় দুটি মূল বিষয়ের কথা খুবই শোনা যায়। এর একটি হল 'ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট' আর অন্যটি 'সোশাল এন্টারপ্রাইজ' (সামাজিক উদ্যোগ)। তবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই সব দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অপরিচিত।

ভারত, তার বিশাল আকারের জন্য নানা রকম গুরুতর সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সব সামাজিক সমস্যাগুলিকে মূলত বর্তমান সম্পদ ও সুযোগের ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিটি সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সুযোগও থাকে অপেক্ষায়। এই সব সুযোগগুলিকে খতিয়ে দেখার ধারণাটাই ধারাবাহিক উদ্যোগ বিকাশের মূল কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকে। উদ্যোগ হল একটা মানবিক মৌলিক প্রয়াস যেটাকে কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে তাকে এক অর্থবহ দিকে চালিত করতে হয়। এই প্রসঙ্গেই সামাজিক উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতার কথা উঠে।

সামাজিক উদ্যোগকে এমন উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যেটি কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগের মতো কাজকর্ম করে পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদান বাড়ানোর জন্য। কিন্তু নিজের কাজকর্মকে পরিচালনার

দ্বারা তার উদ্বৃত্তকে সামাজিক ও পরিবেশগত লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজে লাগায়। এরা রাজস্ব অর্জনকারী ব্যবসা হলেও তার মধ্যে একটা অন্য জটিলতা আছে। কোনও নন-প্রফিট সংস্থা হিসেবেও হোক, বা একটি মুনাফা অর্জনকারী সংস্থা হিসেবেই হোক, একটি সামাজিক উদ্যোগের দুটি লক্ষ্য থাকে :

(১) সামাজিক সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীগত দিক থেকে অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত পরিণাম অর্জন করা, এবং

(২) রাজস্ব উপার্জন

ওপর থেকে অনেক সামাজিক সংস্থাকে দেখে সনাতনি ব্যবসা বলে মনে হয়। কিন্তু আরও গভীরভাবে দেখলে এর মধ্যে সামাজিক সংস্থার সংজ্ঞাদানকারী বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যবসার কেন্দ্রে থাকা বিশেষ লক্ষ্যটি চোখে পড়ে। যেখানে অর্থ উপার্জনটা এক জরুরি সহায়ক ভূমিকায় থাকে।

বিভিন্ন সংস্থাকে সামাজিক উদ্যোগের চালচিত্রে স্থাপন করা যায়, যেটা বেসরকারি ও সরকারি সংস্থার মধ্যে উদ্যোগ ও সংস্থার মিলন ক্ষেত্রকে পরিমাপ করে। উল্লম্ব অক্ষ বরাবর প্রত্যেক উদ্যোগ বা সংস্থাকে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়, এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য দ্বারা। যেখানে সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে একেবারে ওপরে আর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকে একেবারে নীচে।

কোনও সামাজিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে সামাজিক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপায়ে (সামাজিক অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত)। সামাজিক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ের সমাধান খোঁজার চাহিদা থেকেই এবং সেই সব চাহিদা মেটানোর জন্য যেগুলি বেসরকারি বা সরকারি ক্ষেত্রের দ্বারা (উপেক্ষিত বা অপর্যাপ্তভাবে পূরণ করা) হয়েছে। মুনাফা ব্যতিরেকে অন্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমাধান ব্যবহার করে কোনও সামাজিক অর্থনীতির বলিষ্ঠ ধারাবাহিক সমৃদ্ধ ও সকলকে শামিল করে এগিয়ে চলায় সমাজ গড়ে তোলায় সামাজিক অর্থনীতির অনন্য ভূমিকা রয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সীমা সংজ্ঞা দেওয়া রাজনৈতিক কারণে যথেষ্ট কঠিন। যে কোনও সময়েই সংস্থাগুলি 'আংশিক ভিতরে, বা আংশিক বাইরে' হতে পারে। সামাজিক অর্থনীতির বিভিন্ন উপক্ষেত্রের মধ্যে নাড়াচাড়া করার ফাঁকে যে কোনও সংস্থাগুলি আংশিক ভিতরে বা আংশিক বাইরে হয়ে পড়তে পারে। সফল সামাজিক উদ্যোগগুলি সরকারি নীতি সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।

- উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগী সুলভ মনোভাব বাড়িয়ে তোলে,
- সামাজিক দিক থেকে শামিল করে সম্পদ সৃষ্টির জন্য অবদান রেখে,
- স্থানীয় এলাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যক্তি সাধারণ ও জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলে
- সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নতুন পন্থা পদ্ধতি প্রদর্শন করে এবং সকলকে শামিল করে সমাজ গড়ে ও সক্রিয় নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটিয়ে।

দেশের এই বিশালতার জন্য ভারত নানা ধরনের সামাজিক উদ্যোগের মডেল উপস্থাপন করেছে। এগুলো সম্পূর্ণ সরকারি নকশায় তৈরি থেকে শুরু করে বেসরকারি মডেল পর্যন্ত নানা ধরনের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বহু নাম উঠে এলেও এখনও জাতীয় স্তরে কোনও সামাজিক উদ্যোগ সংক্রান্ত নীতি গড়ে উঠেনি।

গত দু'দশকে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনে প্রশংসনীয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি অংশের মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে। এছাড়া পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের ৪০ শতাংশেরও বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে। আর অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে, এখনও প্রায় ৬২ কোটি লোক প্রকাশ্যে মলত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাই সামাজিকভাবে উদৃষ্ট বিনিয়োগের দ্বারা বা ইমপেক্ট ইনভেসমেন্টের মাধ্যমে এইসব বিষয়গুলির মোকাবিলা করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

সামাজিক উদ্যোগগুলি ভারতের সকলে শামিল করে উন্নয়নের কর্মসূচিতে একটা প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। যাই হোক, উন্নয়ন অনেক দেশের মতো ওরা এখনও সরকারিভাবে বা আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়। যদিও দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওরা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

যদিও একটি সামাজিক উদ্যোগ কী তার সংজ্ঞা নির্ধারণেই যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে একবার সংজ্ঞা পাওয়া গেছে এ ধরনের ব্যবসার ধারণার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন পর্যন্ত বিকাশের পথ সুগম করতে বলিষ্ঠ নীতি নিতে পারত। এর মধ্যে স্টার্ট-আপগুলির জন্য যেমন থাকত লগ্নি, ঋণ বা অনুদান থাকতে পারত। কর ছাড়ের মতো উৎসাহভাতা এবং জমি, বিদ্যুৎ ও জলের ক্ষেত্রে ভরতুকিও থাকতে পারত। বর্তমানে বেশিরভাগ স্টার্ট-আপগুলি বিদেশ থেকে লগ্নি পেয়ে থাকে। যাই হোক, ভারতে যথেষ্ট মূলধন রয়েছে। বিশেষ করে সরকার এবং বড় বড় কর্পোরেশনগুলির হাতে যারা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লগ্নিকারক হিসেবে ভূমিকা নিতে পারে।

উপসংহার

অন্তর্ভুক্তিকরণ বা 'শামিল করার' ধারণাটাকে রাজনৈতিক স্লোগান থেকে অর্থবহ কর্মভিত্তিক ধারণায় পালটে ফেলাটাই হল আজকের নীতি নির্ধারকদের কাছে চ্যালেঞ্জ। ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগগুলি এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।❑

[লেখক ইনস্টিটিউট অব স্মল এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর অধিকর্তা।
email : director@isedonline.org.
mathew.econ@gmail.com]

আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের নয়া উদ্যোগ

একটি চুম্বক

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানোর জন্য অতীতে যেভাবে ভাবা হত এখন তা পালটেছে। বলা হয় দেশের উন্নতি তখনই ঘটবে যখন দশের উন্নতি ঘটবে বা দেশের আর্থিক বৃদ্ধি যখন সকল শ্রেণির সকল মানুষকে ছুঁয়ে যাবে। এই দরিদ্র মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতির জন্য অতীতের অন্যান্য সরকারের মতো এই সরকার সর্বতোভাবে প্রয়াসী। তাঁরা এনেছেন নতুন সমস্ত প্রকল্প, নতুন কৌশল। কিন্তু সেই সব প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখবে তখনই যখন যাদের জন্য এই কর্মযজ্ঞ, তারা এতে অংশগ্রহণ করবেন সক্রিয়ভাবে; তখনই তাদের প্রয়োজনমতো গড়ে উঠবে নতুন প্রকল্প যা তারাই সফল করে তুলবেন। আর তাই সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদেই উপযুক্ত প্রচার মাধ্যম ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার অপরিহার্য। লিখছেন **ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।**

সম্প্রতি ভারতের প্রথম আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হল। দেশের ৬৪০টি জেলায় ব্যাপক সমীক্ষার পর গ্রামীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারগুলি আদমশুমারির কাজ সম্পন্ন করেছে। শহরাঞ্চলে সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন ও শহরাঞ্চল দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রক। এতে বেরিয়ে এসেছে বাস্তব চিত্র, বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুরবস্থার ছবি। কতকগুলি তথ্য উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে উন্নয়নের অভিমুখ কী হওয়া উচিত এবং যাঁরা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাঁদের কী কী বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। কী উপায়ে ওই সব দুর্দশাগ্রস্ত আর্থিক দিক থেকে অতিশয় দুর্বল মানুষগুলোকে উন্নয়নের কর্মসূচির পরিসরে আনা যায়, সে কথা জরুরি। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি রূঢ় তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরাঞ্চল ও গ্রাম মিলিয়ে দেশে মোট পরিবারের সংখ্যা ২৪ কোটি ৩৯ লক্ষ। এর মধ্যে গ্রামীণ পরিবার ১৭ কোটি ৯১ লক্ষ। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১০ কোটি ৬৯ লক্ষ। কেবলমাত্র একটি কক্ষ ও রান্নাঘর আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ২ কোটি ৩৭ লক্ষ। ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সি কোনও সদস্য নেই, এমন পরিবার ৬৫ লক্ষ ১৫ হাজার। মহিলা পরিচালিত পরিবার ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার। তফশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবার ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। ২৫ বছরের বেশি বয়সি কোনও সাক্ষর সদস্য নেই, এমন ৪ কোটি ২১ লক্ষ পরিবার রয়েছে। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ। প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম ভিন্ন কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই এমন পরিবার ৭ লক্ষ ১৫ হাজার।

রুজি রোজগারের দিক থেকে দেখলে, কৃষিকাজ থেকে জীবিকা নির্বাহ করে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ। দিন মজুর খেটে উপার্জন ৯ কোটি ১৬ লক্ষের। পূর্ণ বা আংশিক সময়ের গার্হস্থ্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে ৪৪ লক্ষ ৮৪ হাজার পরিবার। অ-কৃষি ও ছোট উদ্যোগ থেকে উপার্জন ২৮ লক্ষ ৮৭ হাজার পরিবারের। সরকারি, বে-সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করে রোজগার ২ কোটি ৫০ লক্ষ পরিবারের। ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার পরিবারের। জঞ্জাল কুড়িয়ে দিন গুজরান করে এমন পরিবারের সংখ্যাও একেবারে কম নয়; ৪ লক্ষ ৮ হাজার। ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকারও কম। মাত্র ৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের আয় মাসে দশ হাজার টাকার বেশি। আর একটি তথ্য গুরুত্বপূর্ণ যে, গ্রামের ৯০ শতাংশ পরিবারের কোনও সদস্যের বাঁধা বেতনের কাজ নেই।

এই সমস্ত তথ্য গ্রাম-ভারতের একটি দুর্দশাগ্রস্ত ছবিরই ইঙ্গিত দেয়। এই রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মহোদয় বললেন যে, এ সমস্ত তথ্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করা ও দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। পরিকল্পনা ও উন্নয়নের লক্ষ্য চিহ্নিত করা সহজ হবে। যেমন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ইতোমধ্যে তার সমস্ত কর্মসূচিতে এই সব তথ্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করা যায়, এই তথ্য রাজ্য, জেলা, ব্লক, গ্রামপঞ্চায়েত ও একেবারে গ্রামস্তরে পরিকল্পনা প্রণেতা ও প্রশাসকদের পক্ষে উপকারই হবে এবং বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। কোনও মনগড়া ধোঁয়াটে ধারণা নয়। তথ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই পরিকল্পনার কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে।

এই যে সকলের, বিশেষত যারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে দুর্বল ও পশ্চাদপদ তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' বলা হয়। এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এক কথায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও আর্থিক বর্গ নির্বিশেষে সকলের উন্নয়ন

নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। 'সবার সঙ্গে সকলের বিকাশ' অর্থাৎ 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'—এটি বর্তমানে ভারতের উন্নয়নের মডেল বা আদর্শ রূপরেখা। এতে ম্যাক্রো-ইকনমিক ও মাইক্রো-ইকনমিক নির্ণায়ক উপকরণ ও উন্নয়ন উদ্যোগ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য অনুসারে, সব বর্গের মানুষের অন্তর্ভুক্তিকরণ যখন হয়, তখনই আর্থিক উন্নতি দীর্ঘমেয়াদি ও নিবিড় হয় এবং এর সুবিধা সকলে বিশেষ মাত্রায় ও সমভাবে ভোগ করে। এই যে উন্নয়নের মডেল, তাতে সকলে বাজার, সম্পদ ও পক্ষপাতহীন নিয়ন্ত্রণযুক্ত (রেগুলেটরি) বাতাবরণ পাওয়ার অধিকার পায়। আবার এই উন্নয়নকে টেকসই করতে দরিদ্র ও বঞ্চিত বর্গের আয় বাস্তবে বাড়তে পারে, এমন উৎপাদনশীল শিল্পে নিয়োগ ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের মতো দেশে এই ধরনের উন্নয়ন কৌশল একান্তই জরুরি। স্বাধীনতার প্রায় ৬৮ বছর পরেও দারিদ্র একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এত বড় দেশ যেখানে বৈচিত্র অপরিসীম এবং জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা এতটা অসম যে, সমাজের একটি বড় অংশ এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির মান, লিঙ্গ সমতার দিক থেকে অভিপ্রেত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রতি নাগরিকের মাসিক মাথাপিছু খরচ (MPCE) ৮১৬ টাকা আর শহরাঞ্চলের নাগরিকের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা ধরা হয়েছিল। দৈনিক খরচ যথাক্রমে ২৭ টাকা ও ৩৩ টাকা। এই গণনায় দেখা যায় যে, দেশে দরিদ্রের অনুপাত ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরের ৩৭.২ শতাংশ থেকে কমে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে দাঁড়িয়েছে ২১.৯ শতাংশে। আর মোট দরিদ্র জনগণের সংখ্যা ২০০৪-০৫ এর ৪০৭.১ মিলিয়ন থেকে কমে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে হয়েছে ২৬৯.৩ মিলিয়ন। দারিদ্র নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে দেশে বিতর্ক হয় এবং তদানীন্তন সরকার ২০১২-র জুন মাসে ড. সি. রঙ্গরাজনের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি বিবেচনা করে প্রতিটি নাগরিকের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দৈনিক ব্যয় যথাক্রমে ৩২ টাকা ও ৪৭ টাকা নির্ধারণ করে। এই হিসাব অনুযায়ী ২৯.৫ শতাংশ নাগরিক দারিদ্রসীমার নীচে।

২০১৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট অনুসারে ভারতের স্থান ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম। ব্রিক্স দেশসমূহের মধ্যেও সবচেয়ে নীচে। লিঙ্গ বৈষম্য সূচকের ক্ষেত্রেও ভারত বেশ নীচে। ভারত CEDAW (কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিস্ক্রিমিনেশন অ্যাগেনস্ট উইমেন বা নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বর্জন সংক্রান্ত চুক্তি) স্বাক্ষর করলেও, মহিলা ও কন্যা সন্তানের অবস্থান এখনও উচ্চস্থানে নয়। CSR (শিশু লিঙ্গ অনুপাত)-এর ক্ষেত্রেও অনেক রাজ্যে প্রতি ১ হাজার পুরুষ শিশুর তুলনায় কন্যা শিশুর সংখ্যা কমেছে। ১৯৬১ সালে তা ছিল ৯৭৬ আর ২০১১-তে তা কমে ৯০৯-এ এসে ঠেকেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশ। নারী শিক্ষার হারও বেড়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার ৮০.৯ শতাংশ আর নারীদের ক্ষেত্রে ৬৪.৬ শতাংশ। এগুলি আশার বিষয় নিঃসন্দেহে। তবে উচ্চ-শিক্ষার মান বিশ্বমানের থেকে নীচে। গ্রামীণ ক্ষেত্রেও শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত কম।

আর একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ম্যাককিনসে রিপোর্ট অনুসারে ভারত এখন দ্রুত নগরায়ণ বা নগর বিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে। ভারতে নগরবাসীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ২০০৮ সালে যা ছিল ৩৮০ মিলিয়ন, তা বেড়ে ২০৩০-এ ৫৯০ মিলিয়ন হবে এমনই বিশ্লেষণ। এটি ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্ত প্রবণতার সঙ্গে রয়েছে দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়াস, খাদ্য ও শক্তি নিরাপত্তা, পানীয় জলের অপ্রতুলতার সমস্যা, শহরের বর্জ্য অপসারণ প্রভৃতি অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণও এই পরিস্থিতিতে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে উঠে আসবে, তা নিশ্চিত।

এই সব তথ্যপঞ্জি থেকে যে বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠছে, সেটাই নির্দেশ করে,

আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আর্থ-সামাজিক তথ্য

স্বাস্থ্য সম্পর্কে	**সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে**
শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার নবজাতকের মধ্যে) — ২০১২	৪২
জন্মহার (প্রতি হাজারে) — ২০১২	২১.৬
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) — ২০১২	৭
শিক্ষা সম্পর্কে	**সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে**
মোট ভর্তির অনুপাত (GER) ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে — ২০১০-১১	১১৫.৫
মোট ভর্তির অনুপাত (GER) ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে — ২০১০-১১	৮৫.২
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (PTR) প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় — ২০১০-১১	৪৩
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (PTR) মধ্যশিক্ষা/উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় — ২০১০-১১	৩৩
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (PTR) উচ্চ বিদ্যালয়/বুনিয়াদি পরবর্তী বিদ্যালয় — ২০১০-১১	৩০
আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ	**সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে**
বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমস্ত অফিসের সংখ্যা — ২০১২	১০৬৯০৩
বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের সমস্ত অফিসের সংখ্যা — ২০১৩	১১৬৪৪৮

তথ্যসূত্র : ভারত সরকারের আর্থিক সর্বেক্ষণ (২০১৩-১৪)

উন্নয়ন কৌশল এমন হওয়া উচিত যাতে দুর্দশাপীড়িত, বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষগুলোকে সঙ্গে নেওয়া যায়। বলা হয়েছে, প্রত্যেক চোখ থেকে অশ্রু মোছাতে হবে।

'The debate is not about whether but how best to provide active government support to the poor and vulnerable. Cash transfer based on the JAM number Trinity—Jan Dhan, Aadhaar, Mobile—offer exciting possibilities to effectively target public resources to those who need it most.' অর্থাৎ বিতর্ক এটি নিয়ে নয়, যে দরিদ্র ও দুর্বল জনসাধারণকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে কি না। প্রশ্ন এটাই যে, সাহায্য পৌঁছনোর সর্বোত্তম উপায়টি কী। এ প্রসঙ্গে নগদ টাকা কীভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া যাবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। জনধন যোজনা, আধার কার্ড ও মোবাইল ফোন—এই তিনের সহযোগে স্বচ্ছভাবে এ কাজ করতে হবে। সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ—অর্থাৎ 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এটাই এখন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির মূলমন্ত্র। মূল কথাটাই হচ্ছে 'Collective Efforts, Inclusive Growth'—সামূহিক প্রচেষ্টা আর অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে আর্থিক ও সার্বিক উন্নতি।

আর্থিক নীতিতে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বৃদ্ধি ও মানবোন্নয়নের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা। এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে কোনও কোনও সময় আপাত-বিরোধাভাস থাকলেও বাস্তবে তা নয়। ভারত মানবোন্নয়ন খাতে ব্যয়ের বিষয়ে সমঝোতা করেনি। হতদরিদ্র, সুযোগে বঞ্চিত, দুর্বল নিম্নবর্গের লোকেদের প্রগতির রথযাত্রায় শামিল করেই আর্থিক উন্নয়নের পথ রচনা করা হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার সফল রূপায়ণ হলেই জাতীয় ব্যয় (আউটলে) সুফলে (আউটকাম)-এ পরিণত হতে পারে।

বিশ্বের আঙিনায় এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP) যে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্' (সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন বা MDGs) ২০১৫ নির্ধারণ করেছিল, সেকথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। ২০০০ সালে বিশ্ব জুড়ে ১৬৬টি দেশের নেতারা উন্নয়নের জন্য দারিদ্র-দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আটটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। এই আটটি লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১) যারা প্রতিদিনে এক ডলারের বেশি খরচ করতে সক্ষম নয়, তাদের সংখ্যা অর্ধেক কমানো। সকলের জন্য পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যার মধ্যে মহিলা ও যুবসম্প্রদায় রয়েছে। ক্ষুধার্তর সংখ্যাও অর্ধেক করা এই লক্ষ্যের অন্তর্গত।

২) সকলের জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার।

৩) লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৫-র মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য পুরোপুরি লুপ্ত করা।

৪) শিশু মৃত্যুর হার কমানো। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ কম করা।

৫) মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো। মাতৃ মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজননক্ষম মায়েদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সীমার মধ্যে এনে ফেলা।

৬) এইচআইভি-এডসের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানো এবং এই অসুখগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। ম্যালেরিয়া-সহ অন্যান্য কঠিন অসুখগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও যথোপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করা। এর জন্য সম্যক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণ। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যকে দেশের আর্থিক নীতিতে জুড়ে দিয়ে এমন কর্মসূচি প্রণয়ন করা যাতে পরিবেশ সম্পদ রক্ষা এবং জীববৈচিত্রের অপচয় বা ক্ষতি রোধ করা যায়। পরিস্রুত পানীয় জল ও স্বচ্ছ পরিবেশ যারা পায় না তাদের সংখ্যা অর্ধেক কম করা। ২০২০-র মধ্যে যাতে দশ কোটি বস্তিবাসীর জীবনের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়, এমন কর্মসূচির সফল রূপায়ণ করা।

৮) সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বে একটি নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অংশীদারিত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা।

এই আটদফা লক্ষ্য স্থির হয়েছে ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ভেবে, যার নিরিখে উন্নয়নের বিচার হবে। এই লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করলে যেটা স্পষ্ট হয়, সেটা হচ্ছে ওই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর কথাই। এই কর্মসূচি শুরুর সময় রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, বান কি মুন বলেছিলেন—'আমরা দারিদ্র দূর করতে সক্ষম। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, পূর্বের সমঝোতাপত্র ও কর্মসূচি সঠিকই ছিল। আমরা জানি কী করতে হবে। শুধু প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সম্মিলিত এবং অবিচল প্রয়াস।'

২০১৫-এর ডিসেম্বরে এই লক্ষ্য পূরণের সময়সীমা শেষ হবে। তার আগে রাষ্ট্রপুঞ্জ যে মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে সেক্রেটারি জেনারেল আশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"The landmark commitment entered into by world leaders in the year 2000—to spare no effort to free our fellowmen, women and children from the abject and dehumanizing conditions of extreme poverty was translated into an inspring framework of eight goals, and then into wide ranging practical steps that have enabled people across the world to improve their lives and their futures prospects. The MDGs helped to lift more than one billion people out of extreme poverty, to make inroads against hunger to enable more girls to attend school than ever before, and to protect our planet." অর্থাৎ এই যে ২০০০ সালে যুগান্তকারী সম্মতিপত্রে স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছিলেন বিশ্বনেতারা, তার ফলশ্রুতি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলময়ই হয়েছে। প্রায় ১০০ কোটির বেশি মানুষের জীবন থেকে দারিদ্রের অভিশাপ মুক্তি ঘটেছে এবং ক্ষুধার্ত মানুষদের পেটে অন্ন জোগানো গেছে।

কত মেয়ে যে স্কুলে শিক্ষা নিতে পারছে। সেটাও কম কথা নয়।

ভারতের বিষয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত সফল। তবে লক্ষ্য থেকে এখনও দূরে রয়েছে এবং আরও জোরদার প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিদিন শিশুকে স্কুলে পাঠানো, নবজাতক ও শিশুর মৃত্যুহার রোধ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শৌচাগার নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারত এখনও পিছিয়ে। তবে দারিদ্রের হার কমিয়ে অর্ধেক করা, প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমানো, ম্যালেরিয়া, যক্ষার প্রকোপ কমিয়ে আনা, দেশকে এডস্ মুক্ত করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত সাফল্য পেয়েছে। এই বিশ্লেষণে আগামী দিনের, অর্থাৎ ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচির কথাও ভাবা হয়েছে। সেই এজেন্ডা, যার মধ্যে রয়েছে 'সাস্টেনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল্স' বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)। MDGs-এর ক্ষেত্রে সাফল্য, অসম্পূর্ণতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করে পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস চালাতে হবে। এর জন্য চাই অধিকতর সম্পদ নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার এবং নতুন উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয়। ২০১৫-র প্রতিবেদনে ভারতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অপূর্ণতা চোখে পড়েছে। যেমন বহু শিশু এখনও স্কুলশিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। আবার অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে যেতে পারছে না। শিক্ষার মানও সব সময় উন্নত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য না থাকলেও, মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমিশন-এর ফলে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমলেও নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশি কমেনি। 'স্বচ্ছ-ভারত' অভিযান শুরু হলেও সকলের জন্য শৌচালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এখনও লক্ষ্যপূরণ হয়নি। একথা অবশ্য ঠিক যে, কয়েকটি রাজ্য আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়িয়েছে; অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থব্যয় নিশ্চিত করেছে। ওই সব রাজ্যগুলিই এগিয়ে রয়েছে। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে ওই সব অগ্রসর রাজ্যগুলির পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

১৯৬০-এর দশক থেকেই ভারতে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থিক সাম্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২০-র মধ্যে ভারতে যুবশক্তির ব্যাপক প্রাধান্য লক্ষ করা যাবে। এই যে যুব জনতার বিস্ফোরণ, তা নতুন সুযোগ সৃষ্টি যেমন করবে, তেমনই আর্থিক পরিকল্পনা প্রণেতাদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো এবং পরিষেবা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তৈরি করার মধ্যেই রয়েছে এই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পথ। এই সব ক্ষেত্রে ব্যয়কে সফল পরিণতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এ বিষয়ে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ভারতে সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যয় করা হয়, তার গতি-প্রকৃতি বা প্রবণতার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যয় করে এবং যেটি সামগ্রিক ব্যয়ের যে অনুপাতে হয়েছে সেই তথ্য থেকে একটি মিশ্রচিত্র পাওয়া যায়। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় সামগ্রিক ব্যয়ের ২৪.৭ শতাংশ ছিল। ২০১২-১৩-তে তা কমে হয় ২২.৯ শতাংশ। আবার ২০১৩-১৪-তে হয় ২৪.১ শতাংশ। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে তা সামান্য কমে হয় ২২.৩ শতাংশ। আবার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-কে ধরলে সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যয় ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০১৪-১৫-তে তা কমে ৬.৭ শতাংশ হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই রকম ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার ব্যয় জিডিপি-র ৩ শতাংশের মতো। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় জিডিপি-র ১.২ শতাংশ থেকে ১.৪ শতাংশের মধ্যে লক্ষ করা যায়। জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ব্যয় এই পরিষেবাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার বিষয়ে একটি বড় অন্তরায়।

সহস্রাব্দের শুরুতে রাষ্ট্রসংঘের স্থির করা লক্ষ্য পূরণে ভারতের প্রচেষ্টা যে অব্যাহত থাকবে, তা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছে। একদিকে যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিকাঠামো নির্মাণ ও উৎপাদনশিল্পে (ম্যানুফ্যাকচারিং) বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার নিরন্তন প্রয়াস, অপরদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল শ্রেণিকে সহায়তা করার নানা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ করার মতো। প্রথমত, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির হাতে অনেক বেশি অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির ক্ষেত্রেও এই বর্ধিত অর্থসংস্থান করা হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকারগুলি স্থির করবে কোন কোন প্রকল্প তারা নিজেরাই রূপায়িত করবে। তৃতীয়ত, আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত জনগণনার রিপোর্ট যার কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেটি দারিদ্রসীমার নীচে থাকা জনগণ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করবে। এটি উন্নয়নের লক্ষ্য বা অভিমুখ স্থির করতে প্রভূত সাহায্য করবে। এই যে পরিস্থিতি, তাতে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে উন্নয়নের যে কর্মসূচি ও পরিকল্পনা তা যেমন বেগবান হবে, তেমনই একটি নতুন মাত্রা পাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত কয়েকটি প্রকল্পের কথা এবার উল্লেখ করতেই হয়। এগুলি বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বৃত্তে নিয়ে আসা হবে—সবার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা), সবার জন্য দুর্ঘটনা বিমা (প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা), সবার জন্য মেয়াদি জীবনবিমা (প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা), সবার জন্য পেনশন (অটল পেনশন যোজনা)। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা দুর্বলতর কৃষকদের সুবিধার জন্য।

এই যে দ্বিমুখী আর্থিক কৌশল, তাতে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে দুর্বল শ্রেণির জন্য রাষ্ট্রের কর্মসূচি এমনভাবে মেশানো হয়েছে যাতে শুধু জিডিপি-ই নয়, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও ঘটবে। সরকার অনেক ক্ষেত্রে

ভরতুকি দেয়, যাতে বিভিন্ন দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য ও পরিষেবা নাগরিকদের সাধ্যের মধ্যে থাকে। এর জন্য যে বার্ষিক খরচ তা মোটামুটি ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা বা জিডিপি-র ৪.২ শতাংশ। এই ভরতুকির বিষয়ে সরকারকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হয়। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দ্রব্যগুলির চাহিদা ও জোগানের স্থিতিস্থাপকতা একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। দামের কমা-বাড়ার সঙ্গে যে সমস্ত উপভোক্তার চাহিদার বিশেষ হেরফের হয় না। তারাই ভরতুকি থেকে বেশি লাভবান হয়। সারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সারে ভরতুকির মূল উদ্দেশ্য, যাতে গরিব চাষিরা সুবিধা পাই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ধনী চাষিরা ও সার উৎপাদকেরাই ভরতুকি থেকে লাভবান হচ্ছে। দরিদ্র চাষিরা বঞ্চিতই থেকে যায়। তবে গ্রহীতার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরতুকির নগদ রাশি পৌঁছে দেবার যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে তা দারিদ্র-দূরীকরণ কর্মসূচিকে অনেকটা স্বচ্ছ করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে প্রায় ১২৫.৫ মিলিয়ন জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ৭৫৭ মিলিয়ন আধার কার্ড নম্বর এবং প্রায় ৯০৪ মিলিয়ন মোবাইল ফোন রয়েছে। যখন JAM-এর তিনটি নম্বরকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, তখন নগদ রাশি পাঠানো (ক্যাশ ট্রান্সফার) সহজ হবে এবং ত্রুটিহীনভাবে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের কাছে পরিষেবা পৌঁছনোর অমিত সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' অর্থাৎ উন্নয়নের রথে সকলকে, দুর্বল শ্রেণিকে নিয়ে চলার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদী 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট'-এ ব্যক্ত করেছিলেন—

'Have we ever thought of recession as being the result of low per capita income in countries where a majority of the global population lives? Have we ever thought of its solution in terms of enhancing the common man's employabity, income and purchasing power? This is the biggest task at hand in India.' অর্থাৎ আমরা কি ভেবেছি সেই মন্দার কথা যা দেশের নাগরিকের মাথাপিছু গড় আয় খুব কম হওয়ার জন্যে সৃষ্ট? সেই সমস্ত নাগরিকদের নিয়োগ যোগ্যতা, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যেই এ সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে। এই লক্ষ্যে কাজ করাই ভারতের প্রাথমিক কর্তব্য।

যোজনা কমিশনের স্থানে এখন নীতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে। এটি একটি 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক পরিষেবা প্রকল্প রয়েছে, সেগুলিকে সুচারু, যথাযথ ও স্বচ্ছভাবে রূপায়ণ করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ সবের উদ্দেশ্য একটাই—সকল নাগরিককে উন্নয়নের মুখ্যধারায় নিয়ে এসে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো। নিতি আয়োগের এই সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্টে প্রকল্পগুলির সংখ্যা কমিয়ে ৩০টি করার কথা বলা হয়েছে। এতে বাস্তবায়নের পথে জটিলতা কমবে।

তবে একটা সমস্যার কথা পূর্বোত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উঠিয়েছেন। যেটা হচ্ছে, পূর্বতন যোজনা কমিশন থেকে যে বিশেষ ক্যাটিগরির মর্যাদা তাঁরা পেতেন, অর্থবণ্টন ও বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিশেষ ব্যয়ের ব্যবস্থার বিষয়ে তা না থাকায় এক শূন্যতা বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আশা করা যায় দেশের ওই অঞ্চলের বিশেষ চাহিদা ও অনগ্রসরতার কথা ভেবে একটি সদর্থক সিদ্ধান্ত অচিরেই বেরিয়ে আসবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই বিশেষ মর্যাদা পূর্বোত্তর ভারতের জন্য প্রয়োজন যাতে কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা ও অর্থ পাওয়া যায়। পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য এটা খুব জরুরি। এ নিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকে ও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সৌজন্যে এক গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র মিলবে, এটাই সকলের আশা।

অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে যে উন্নয়ন বা প্রগতির যে মডেল সেটি একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতি, সমাজনীতি, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম এবং প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক অবস্থান। সে কারণেই রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক প্রগতির জন্য যে গবেষণাকেন্দ্র বা রিসার্চ ইনস্টিটিউট (UNRISD) আছে, তা বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিও নতুন উঠে আসা অর্থনীতিতে কীভাবে সামাজিক নীতির প্রতিফলন ও পরিবর্তন হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে চলেছে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, তার কোনও বিকল্প সমাধান সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় কি না তা দেখা।

ভারতেও সামাজিক নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক (এরিয়া অ্যাণ্ড টার্গেট স্পেসিফিক) কমসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, প্রান্তিক চাষি, অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর বর্গের লোকদের যাতে উন্নয়নের জাতীয় মুখ্যধারায় নিয়ে আসা যায়, তার জন্যেই যে একগুচ্ছ উন্নয়ন এজেন্ডা। এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তন সচল কিন্তু ধীর লয়ে ঘটতে থাকা একটি প্রক্রিয়া। অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ তখনই সফল হবে যখন আপামর নাগরিকেরা উৎসাহিত হয়ে এতে অংশগ্রহণ করবে। যেমন আংশিকভাবে হলেও প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার জন্য নাগরিকদের কিছুটা অর্থব্যয় করতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক কৌশল হিসাবেও এটি ভালো। কারণ, যেখানে নিজেদের ব্যয় করা অর্থ কোনও প্রকল্পে জড়িয়ে থাকে, সেখানে মানুষ ওগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর একটি বিষয় বলতেই হয় যে, প্রকল্প দুটি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া, বিমা প্রকল্পগুলিতে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টধারী সাধারণ নাগরিকই লক্ষ্য। কোনও বিশেষ পেশার গোষ্ঠী বা পরিবার নয়। ব্যক্তি নাগরিক এর কেন্দ্রবিন্দু। এতে জনধন যোজনার অ্যাকাউন্টগুলি সচল থাকার সম্ভাবনা বেশি। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে,

প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচার এবং জনমানসে যাতে প্রভাব ফেলে সেদিকে নজর দিতে হবে। ড. উইলবার শ্র্যাম যেমন লিখেছিলেন, এগুলি বুলেটের মতো হয়, যে কোনও কাঙ্ক্ষিত লোককে তাক করে ছুঁড়লে সে আহত হয়ে পড়ে যাবে।

বার্তাগুলিকে উপর থেকে নীচে বা পাশাপাশিভাবে বিক্ষিপ্ত করার বস্তু হিসাবে দেখা যাবে না। এর জন্য বহুবিধ মিডিয়া (মাধ্যম) ব্যবহার করতে হবে। উন্নয়নমূলক জনসঞ্চার বা নিবিড় জনসংযোগ সফল করতে হলে কী করা প্রয়োজন, ড. শ্র্যাম তার পথ নির্দেশ করেছেন—

'Activity at the village level is the only means of effective village change and whereas communication has to travel down, it has to travel up, and much more important, it has got to travel round at the village level. People have to work together and discuss together; they have got to make their changes together. Only when communication can build itself into the social structure, it is going to show any real hope for extensive results.'

অর্থাৎ জনসঞ্চার একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। এটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনে পরিবর্তন আনার মাধ্যম হতে পারে তখনই, যখন শুধু উপর থেকে নীচে নয়, নীচ থেকে উপরেও আসতে পারে এবং সর্বোপরি চারদিকে ছড়াতেও পারে। এটিকে সমাজের কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। তবেই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে।

আর আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মূল লক্ষ্যই হল পরিবর্তন। সমস্ত রকম ঢক্কানিনাদ, প্রযুক্তি প্রয়োগের পরেও তাই দেখতে হবে দারিদ্রের হার বাস্তবে কতটা কমল। এটাই সাফল্য পরিমাপের কষ্টিপাথর। আসলে প্রযুক্তি বা কারিগরি কৌশল পরিচালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিসর ও পৌঁছনোর ক্ষমতা সীমিত। মূল কথাটি কেন্টারো তোয়ামা (যিনি ভারতে মাইক্রোসফট্ গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন) বলেছেন—'What people do with technology, depends on what they can do and want to do even without the technology.' অর্থাৎ প্রযুক্তি ব্যবহার না করে মানুষ যতটুকু করতে পারে এবং করতে চায়, তার উপরই নির্ভর করে প্রযুক্তির সহযোগে সে কী করবে।

পরিশেষে, আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে পরিণত হবে এমন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যাতে সকলের অংশীদারিত্ব থাকে। আর এই 'ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি' (সর্বাত্মক গণতন্ত্র) তখনই সফল বলা যাবে, যখন সমাজের সঙ্গে অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রকৃতি এক সুসংহত রূপধারণ করবে। তাই এতে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র এবং পরিবেশগত গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে। কল্যাণময় রাষ্ট্র বা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' প্রতিষ্ঠা তখনই সার্থক। ❑

[লেখক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল, সমাচার, আকাশবাণী এবং প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার, ভারত সরকার।
email : bandyopk@yahoo.co.in
website : www.pradiptobandopadhyay.com]

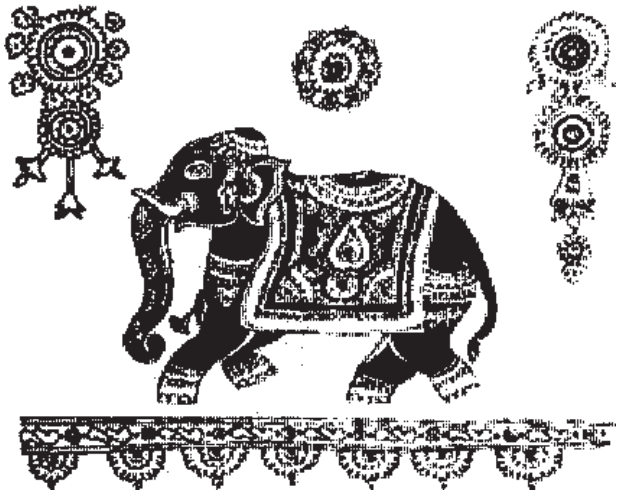

সকলের ভারত

সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় যুক্ত উন্নয়ন

যুক্ত বা সর্বাত্মক উন্নয়ন অর্থাৎ যার দ্বারা মানুষের জীবনমান উন্নত হয় সেই উন্নয়ন; যেখানে উন্নয়নের ফলে সমাজের বিকাশ ঘটে, সেই উন্নয়ন। এ উন্নয়ন শুধুমাত্র আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নয় কারণ এখানে আর্থিক বৃদ্ধি সর্বস্তরে মানুষকে ছুঁয়ে যায় না বা তাদের সার্বিক উন্নয়ন দ্বারা সংঘটিতও হয় না। এ ব্যাপারে সরকারি প্রয়াস, প্রয়োগ এবং তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করছেন **উৎপল চক্রবর্তী।**

শপথ গ্রহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যে, ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় ভাষণে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল সুর ছিল "সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ"। ওই ভাষণে দেশবাসীর কাছে আরও যে আবেদনগুলি রাখা হয়েছিল তা হল, দারিদ্র ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে সকল ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রয়াস। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে তারও মূল সুর হল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বা সংযুক্তিকরণ (ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশন), উন্নত স্বাস্থ্য বিধান (স্যানিটেশন) , শিক্ষা, নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা, যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্যই রয়েছে নারী, শিশু এবং অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ। একই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উন্নত পরিবেশ রক্ষা এবং আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমতা এবং স্থায়িত্বের উপর।

ভারতে বৃদ্ধির (গ্রোথ) লক্ষ্যে সকলকে যুক্ত করার কথা অবশ্য বলা হচ্ছে একাদশ পরিকল্পনার সময় থেকে (২০০৭-২০১২)। ওই পরিকল্পনার সূচনাপর্বে পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া একটি আলোচনায় এই যুক্ত (সার্বিক বা সর্বাত্মক) উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন : "Achieving a growth process in which people in different walks in life...feel that they too benefit significantly from the process" (আলুওয়ালিয়া, ২০০৭)। সন্দেহ নেই, বিগত প্রায় তিন শতকের আপেক্ষিক দারিদ্র এবং বঞ্চনার পর সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ভারত তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকী স্বাধীনতার পরবর্তী তিনটি দশকেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত নগণ্য, যদিও এই দশকগুলি ছিল পরিকল্পনার দশক। কিন্তু পরবর্তী দুটি দশকে সামান্য তারতম্য সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতিতে গড়ে বৃদ্ধি ঘটেছে ৫.৭ শতাংশ হারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে যখন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৮.১ শতাংশ, একাদশ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় যে বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল ৮.৫ শতাংশ। প্রশ্ন হল এই শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ সকলকে যুক্ত করে শ্রীবৃদ্ধির প্রয়াস বাস্তবে দারিদ্রের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় এই যুক্ত উন্নয়নের প্রয়াস কতটা দারিদ্র হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান বছরের ডিসেম্বর মাসেই সমাপ্ত হতে চলেছে 'সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন' (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) কর্মসূচির আপাত সীমারেখা। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে আগামী সেপ্টেম্বরে বিশ্ব নেতৃত্ব সম্মিলিত হয়ে এই কর্মসূচির ভবিষ্যৎ হিসাবে নির্ধারণ করবেন এক স্থায়ী উন্নয়নের রূপরেখা। ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত এই উন্নয়নের রূপরেখায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতেও একই সময়কালে এই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবে কী ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে তারও মূল্যায়ন একইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান আলোচনায় এই লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষাপটেই আমরা যুক্ত উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করব।

বৃদ্ধি বনাম উন্নয়ন

অর্থনীতিতে বৃদ্ধি (বা বিকাশ) এবং উন্নয়ন শব্দ দুটি সমার্থক নয়। বৃদ্ধি শব্দটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ধারণা। কিন্তু কোনও কারণে একটি দেশে বিশেষ একটি সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও সেই বৃদ্ধি গরিবদের সপক্ষে নাও যেতে পারে। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় আকস্মিক আয় বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। যে কারণে সরকারকে মাঝে মধ্যেই দরিদ্রদের পক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে উন্নয়ন শব্দটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর্থিক বৃদ্ধি ছাড়াও ভালো থাকার আরও কিছু বিষয়, যেমন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। ফলে যুক্ত উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝব আয়ের বৃদ্ধির বণ্টনের পাশাপাশি সকলের ভালো থাকারও সুষম বণ্টন। প্রকৃতপক্ষে সহস্রাব্দের

লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন, এই বণ্টনের নিরিখে যুক্ত উন্নয়নের সাফল্যের মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। অন্যদিক থেকে দেখলে, এই যুক্ত উন্নয়নের সাফল্যই মানব উন্নয়নের সূচকগুলিরও ইতিবাচক পরিবর্তনের সহায়ক। এই কারণেই বর্তমান আলোচনায় বৃদ্ধির পরিবর্তে যুক্ত উন্নয়ন শব্দটিই ব্যবহার করব।

একাদশ পরিকল্পনা ও যুক্ত উন্নয়ন

ভারতে একাদশ পরিকল্পনায় (২০০৭-২০১২) অতি দ্রুত সকলকে যুক্ত করে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক বৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছিল ৯ শতাংশ। এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল প্রধানত দুটি কারণে, প্রথমত বৃহত্তর জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয়ত সকলকে যুক্ত করে দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ। এই পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। কিন্তু এই পরিকল্পনার শেষ বছর অর্থাৎ ২০১১-১২ সালে এই বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৮ শতাংশে, অর্থাৎ এই পরিকল্পনার সার্বিক সময়কালে ৯ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে কমে দাঁড়ায় ৮.২ শতাংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দশম পরিকল্পনায় ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির অনুপাতে একাদশ পরিকল্পনার সময়কালের এই বৃদ্ধি ছিল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। অর্থাৎ এই সময়কালে মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ। এছাড়াও এই সময়কালে কেন্দ্র এবং রাজ্য এই উভয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সকলকে যুক্ত করে উন্নয়নের কর্মসূচিগুলিতে সম্পদের জোগানও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এই সময়কালেই কয়েকটি অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর রাজ্য যেমন বিহার, ওড়িশা, আসাম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশেরও কম। ফলে একাদশ পরিকল্পনায় আর্থিক বৃদ্ধির সুষম বণ্টন হয়েছে এমন দাবি করা যায় না।

সারণি-১
একাদশ পরিকল্পনায় রূপায়িত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচি	কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বা বিভাগ	একাদশ পরিকল্পনায় মোট ব্যয়
(১)	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান কর্মসূচি	গ্রামোন্নয়ন	১,৫৬,৩০১
(২)	ইন্দিরা আবাস যোজনা	গ্রামোন্নয়ন	৪১,৪৮৬
(৩)	জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি	গ্রামোন্নয়ন	২৩,৫৩৬
(৪)	প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা	গ্রামোন্নয়ন	৬৫,০০২
(৫)	জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬৯,২১৪
(৬)	সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প	নারী ও শিশু উন্নয়ন	৩৮,৯৮০
(৭)	মিড ডে মিল	বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা	৩৮,৬০২
(৮)	সর্বশিক্ষা অভিযান	বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা	৭৭,৫৭৬
(৯)	জেএনএনইউআরএস	নগর উন্নয়ন	৪৮,৪৮৫
(১০)	সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন	জলসম্পদ	৪৬,৬২২
(১১)	রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনা	বিদ্যুৎ	২৫,৯১৩
(১২)	পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান	পানীয় জল সরবরাহ	৪৬,৭২২
(১৩)	রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা	কৃষি ও সমবায়	১৮,৫৫০
	মোট		৬,৯৬,৯৮৯

সূত্র : দ্বাদশ পরিকল্পনার অ্যাপ্রোচ পেপার।

যুক্ত উন্নয়ন ও সরকারি কর্মসূচি

যুক্ত উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং সেই কারণেই এই জাতীয় উন্নয়নের অগ্রগতির পরিমাপ করা অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। সাধারণভাবে এই উন্নয়ন যেমন দারিদ্র হ্রাসকে প্রভাবিত করবে তেমনি তার প্রভাব একান্তভাবে প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যের উন্নতিতে, সর্বজনীন বিদ্যালয় মুখীনতার মধ্যে, শিক্ষার মানোন্নয়ন-সহ উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে। এছাড়াও এই উন্নয়নের প্রতিফলন একান্তভাবে প্রত্যাশিত উন্নত কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্বাহের মধ্যে এবং সেইসঙ্গে সুস্থ জীবনযাপনের অন্যান্য শর্তগুলি যেমন উন্নত জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, সড়ক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান (স্যানিটেশন) এবং বাসগৃহের সংস্থানের মধ্যে। বিশেষ মনোযোগ দাবি করে তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জনগোষ্ঠী-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিযুক্ত গোষ্ঠীগুলি। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলির প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে যুক্ত উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ এবং সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানো শুধু সরকারি কর্মসূচি এবং নীতি নির্ধারণের উপর নির্ভর করে না, এর জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরবরাহের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন, যা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। জোগানের এই দিকগুলি সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি যুক্ত উন্নয়নের সাফল্যের আরও একটি পূর্বশর্ত হল উন্নয়নের সুবিধাভোগী অথবা ঝুঁকি বহনকারীদের মধ্যে কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে কিংবা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এই প্রেক্ষাপটে একাদশ পরিকল্পনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ উদ্যোগে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি হাতে নেওয়া

হয়েছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে সারণি-১ থেকে।

দেখা যাচ্ছে, এই কর্মসূচিগুলির অধিকাংশই কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (সেন্ট্রালি স্পনসর্ড) এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সুনির্দিষ্ট অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্মিত। তাছাড়া এর অনেকগুলিই একাদশ পরিকল্পনার আগে থেকেই চালু হয়েছে। কিন্তু একাদশ পরিকল্পনার সময়কালে প্রায় ৭,০০,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি এই ব্যয়বরাদ্দ সত্ত্বেও সব রাজ্যে এগুলি সমানভাবে কার্যকার তা বলা যায় না। সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার বেশ কিছু সমীক্ষায় কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে নানাবিধ দুর্নীতি ও দুর্বলতা উঠে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কর্মসূচিগুলির প্রভাব ভারতের বৃদ্ধি তথা উন্নয়নে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ জীবনযাত্রার উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। ২০০৬-০৭ সালের সূচনাপর্ব থেকে একাদশ পরিকল্পনার সমাপ্তি পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে প্রায় ৯৮৭ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে ২০১০-১১ সালেই ৫.৪৫ কোটি পরিবারের ২৫৩.৬৮ কোটি শ্রম দিবস যুক্ত হয়েছে। এই কর্মসূচির পরোক্ষ প্রভাবে কৃষি শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে অন্যত্র যাবার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনায় ৯০.৯৬ লক্ষ স্বরোজগারিকে সহায়তা দেবার লক্ষ্যমাত্রায় অতিক্রম করা গেছে। ৯৪.৩৩ লক্ষ স্বরোজগারি পেয়েছেন অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়েছে ১০৩.৭১ শতাংশ হারে। শহুরে রোজগার যোজনার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩.৭১ লক্ষ এবং বাস্তবে সহায়তা দেওয়া গেছে ৫.০৬ লক্ষকে অর্থাৎ সাফল্যের হার ১৩৬.২২ শতাংশ। একই সঙ্গে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ১.৩৯ কোটির লক্ষ্যমাত্রায় বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে ১.২৬ কোটি গ্রামীণ আবাস, শতকরা হিসাবে ৯১.০৮ শতাংশ।

দারিদ্র ও কর্মসংস্থান

দারিদ্র হ্রাস এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যুক্ত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। দারিদ্রের পরিমাপের বিষয়টি সারা পৃথিবীতেই বেশ বিতর্কিত। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) তৈরি মডেল অনুযায়ী দারিদ্রের ধারণাই বহুমাত্রিক। এর মধ্যে রয়েছে আয়, ভোগ্য ব্যয়, শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয় এবং অপুষ্টি। ভারতে দারিদ্রের এই পরিমাপ করা হচ্ছে মাথাপিছু ভোগ্য ব্যয়ের উপর। সর্বশেষ দারিদ্রসীমা তৈরি হয়েছে ২০০৯ সালে দেওয়া তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে। জাতীয় স্তরে গ্রামীণ দারিদ্রের সীমারেখা হল ৪৪৬.৬৮ টাকা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫৭৮.৮ টাকা। দারিদ্রের এই সীমারেখার উপর ভিত্তি করে ২০০৪-০৫ সালে ভারতীয় জনসংখ্যার ৩৭.২ শতাংশ ছিল দরিদ্র, গ্রামীণ ভারতের ক্ষেত্রে এই হার ৪১.৮ শতাংশ এবং শহরের ক্ষেত্রে ২৫.৭ শতাংশ। তেন্ডুলকর কমিটির দারিদ্রসীমা অনুযায়ী ভারতে গ্রামীণ দারিদ্র অপ্রত্যাশিতভাবে হতাশাব্যঞ্জক এবং একই কারণে সার্বিক দারিদ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তেন্ডুলকর কমিটির এই সীমারেখা অতীতের বছরগুলির উপর প্রয়োগ করলে দেখা যাবে ১৯৯৩-৯৪ সালের তুলনায় ২০০৪-০৫ সালে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে ৮ শতাংশ। অর্থাৎ একাদশ পরিকল্পনার সময়কালে বার্ষিক দারিদ্র হ্রাসের পরিমাণ ছিল ০.৮ শতাংশ, যদিও এই পরিকল্পনার বার্ষিক দারিদ্র হ্রাসের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২ শতাংশ। কিন্তু তার চেয়েও বেদনাদায়ক প্রশ্ন হল সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রকে ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল ভারত। তবু আশাব্যঞ্জক এই যে, যুক্ত উন্নয়নের বিশেষত দরিদ্রদের সপক্ষে উন্নয়নের যেটি অন্যতম প্রধান শর্ত সেই গ্রামীণ মজুরি অর্থাৎ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ২০০৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় বৃদ্ধির হার ছিল ১৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ (৪২ শতাংশ) এবং ওড়িশা (৩৩ শতাংশ)। এমনকী বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যেও এই সময়কালে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৯ এবং ২০ শতাংশ। ভারতীয় সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য তেন্ডুলকর কমিটির দারিদ্র পরিমাপের এই পদ্ধতির সঙ্গে একমত নন। তাদের মতে এই পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করা দরিদ্রের সংখ্যার চেয়ে বাস্তবে দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁরা আরও মনে করেন যে প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৩-৯৪ সালের চেয়ে ২০০৪-০৫ সালে দারিদ্র আরও বৃদ্ধি পেয়েছে (পট্টনায়ক, ২০১০)।

কর্মসংস্থান সম্পর্কে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০০৯-১০ সালের ৬৬তম রাউন্ড থেকে দেখা যায় ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১১.৭ মিলিয়ন (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ২০০৯-১০)। এই বৃদ্ধি আগের বছরগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই সময়কালে দৈনিক ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ১৮ মিলিয়ন, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল অস্থায়ীভাবে নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। যদিও এই সুযোগ গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে কৃষিতে অস্থায়ী নিয়োগের তুলনায় যথেষ্টই আকর্ষণীয়, কিন্তু স্থায়িত্বের প্রশ্নে এই সুযোগ আশাব্যঞ্জক নয়। ৬৬তম সমীক্ষা থেকে আরও দেখা যায় যে এই সময়কালে শ্রমশক্তি হ্রাস পাবার আরও একটি বড় কারণ হল শিক্ষার প্রতি যুব শক্তির উৎসাহ এবং শ্রমিক হিসাবে নির্ধারিত বয়সের মহিলাদের নিম্নহারে আত্মপ্রকাশ। ২০০৯-১০ সালে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে ৮৯.৩ শতাংশই ছিল বিদ্যালয়ে, ২০০৪-০৫ সালে যে হার ছিল ৮২.৪ শতাংশ। মেয়েদের ক্ষেত্রেও ২০০৪-০৫ সালের ৭৯.৬ শতাংশের তুলনায় ২০০৯-১০ সালে এই বিদ্যালয়মুখীনতার হার ছিল ৮৭.৭ শতাংশ। আবার ১৫-১৯ বছরের ছেলেদের মধ্যে ২০০৪-০৫ সালের ৪৩.২ শতাংশের তুলনায় এই সময়কালে বিদ্যালয়মুখীনতার হার ছিল ৫৯.৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ছিল আরও

বেশি, ৪০.৩ শতাংশ থেকে ৫৪.৬ শতাংশ। এমনকী পরবর্তী বয়ঃক্রম ২০ থকে ২৪-এর মধ্যে ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ সালে শিক্ষায় যুক্ত থাকার হার যথাক্রমে ২২.৫ এবং ১২.৮ শতাংশ, ২০০৪-০৫ সালে যা ছিল যথাক্রমে ১৪.৯ এবং ৭.৬ শতাংশ। সব মিলিয়ে এই বয়ঃক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকার সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে দাঁড়ায় ৬০ মিলিয়ন, ২০০৪-০৫ সালে যা ছিল প্রায় ৩০ মিলিয়ন, ফলে সার্বিকভাবে যে বেকারত্বের হার ১৯৯৩-৯৪ সালের ৬.০৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭.৩১ শতাংশ এবং ২০০৪-০৫ সালে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪.২৮ শতাংশ, ২০০৯-১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৬.৬০ শতাংশে। আবার এই সময়কালেই উৎপাদন শিল্পে যদিও ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় ২০০৯-১০ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বাৎসরিক ৯.৫ শতাংশ হারে, ৬৬তম নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী একাদশ পরিকল্পনায় উৎপাদন শিল্পে কর্মসংস্থান প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পেয়েছে।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

মানুষের ভালো থাকার তথ্য মানবোন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হিসাবে সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে গৃহীত হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। একাদশ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত সম্পদের জোগান-সহ স্বাস্থ্যের উন্নয়নে যে বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিশু ও মায়ের মৃত্যুহার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, টীকাকরণ ইত্যাদি। একাদশ পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় এই সূচকগুলির ক্ষেত্রে ভারতে অতীতের চেয়ে কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। যেমন ২০০৬ সালের শিশু মৃত্যুহার ৫৭.০ শতাংশ থেকে ২০০৯ সালে কমে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ২০০৬ সালের ৫৪ শতাংশ থেকে ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩ শতাংশ। একইভাবে এই সময়কালে মাতৃত্বের মৃত্যুহারও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একাদশ পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১ শতাংশরেও কম, বাস্তবে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেকটাই কম, যদিও এই বরাদ্দের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধান এবং পানীয় জলের ব্যয়বরাদ্দ যুক্ত করা হয় তবে এই ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১.৮ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে, ২০০৪ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এশীয় মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন পাকিস্তান (১.০), বাংলাদেশ (১.৫), নেপাল (১.৫), শ্রীলঙ্কা (১.৮) এবং ভুটান (৩.৬) [ইউএনডিপি, ২০০৪]। ভারতের ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত ব্যয় শুধু কমই ছিল না, বরং ১.০৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ০.৯১ শতাংশে। এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের একটি তথ্য থেকে দেখা যায়, ভারতে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ জনসংখ্যার জন্য দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে ১৬.৪ শতাংশ, যেখানে বিত্তবান ২০ শতাংশের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীর এই পরিমাণ ৪৪.৪ শতাংশ (জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, ২০০৬)। সমীক্ষা থেকে আরও দেখা যায় যে প্রায় ২৫ শতাংশ দরিদ্রতম মানুষ চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের কারণেই চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত (বিশ্ব ব্যাংক, ২০০২)। ফলে পাঞ্জাবের মতো ধনী রাজ্যেও চিকিৎসার কারণে কৃষককে তার অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হতে হয়েছে এবং অপরিশোধ্য ঋণের বোঝায় জর্জরিত হতে হয়েছে (সিং, ২০১০)।

ভারতের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার কাছে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল বরিষ্ঠ নাগরিকের ক্রমবৃদ্ধি, প্রায় এক শতাব্দী আগেও যা উদ্বেগের কারণ ছিল না। হিসাব করে দেখা গেছে ১৯৮১ সালে এই নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৫ মিলিয়ন (৬.৫ শতাংশ), ২০১৬ সালের শেষে যার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১১৪.২ মিলিয়ন (৯ শতাংশ) [ভারত সরকার, ২০০৬]। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিকল্পনায় যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই গড় আয়ুর প্রশ্নে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে তীব্র বৈষম্য লক্ষ্য করা যেমন, কেরালার নারী ও পুরুষের গড় আয়ু যথাক্রমে ৭৬ এবং ৭০। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এই উভয়লিঙ্গের গড় আয়ু ৬৭.৪ বছর। কিন্তু বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই গড় আয়ু ৫৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি ভারতীয় পরিকল্পনার কাছে একটি কঠিনতম চ্যালেঞ্জ।

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যুক্ত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত সকলের জন্য শিক্ষা। ২০০৯ সালে গৃহীত শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই আইন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকেও অন্তত ২৫ শতাংশ শিশুকে অবৈতনিক শিক্ষাদানে বাধ্য করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০৩ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষায় যুক্ত হবার সংখ্যা ৫৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯২ মিলিয়ন (বিশ্ব ব্যাংক, ২০১০)। এছাড়াও অনুমান করা হয়েছে যে প্রায় ৮ মিলিয়ন শিশু ক্রমশ এই উদ্যোগে উপকৃত হবে। এছাড়াও একাদশ পরিকল্পনার সময়সীমায় গ্রামীণ এলাকায় ৬-১৪ বছরের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে যা ছিল ৬.৬ শতাংশ। পাশাপাশি ১১-১৪ বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই সময়কালে এই সংখ্যা ১১.২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৯ শতাংশ। যদিও প্রকৃত সংখ্যার বিচারে এক বৃহৎ অঙ্কের শিশু আজও বিদ্যালয় বহির্ভূত। অন্যদিকে বুনিয়াদি কিংবা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পর একটি বৃহৎ সংখ্যার শিশু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চতর এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের গুণগত শিক্ষা ও সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি বড় অন্তরায়। একইসঙ্গে সমস্যা হল শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ। দ্বাদশ পরিকল্পনায় তাই শিক্ষায় জাতীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের (PPP) কার্যকরী মেলবন্ধন।

দ্রুত নগরায়ণ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

২০১১ সালের জনগণনায় ভারতীয় জনসংখ্যার ৩১.২ শতাংশ বসবাস করে শহরাঞ্চলে, ২০০১ সালে যার পরিমাণ ছিল ২৭.৮ শতাংশ। অনুমান করা হয়েছে ২০৩০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০.০ শতাংশ। এই দ্রুত নাগরিক জনবৃদ্ধি ভারতীয় নগরায়ণের কাছে ক্রমশ একটি বড় সমস্যায় রূপান্তরিত হবে। কারণ এই নগরায়ণ সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে সড়ক, রেল যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, গ্যাস সরবরাহ-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে। হিসাব করে দেখা গেছে সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে একাদশ পরিকল্পনার প্রথম বছরে যে বরাদ্দ ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫.৭ শতাংশ, ওই পরিকল্পনার শেষ বছরে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮.০ শতাংশ। কিন্তু দ্বাদশ পরিকল্পনায় এই নগরায়ণ আরও যে দাবিগুলি নিয়ে উপস্থিত হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উন্নত জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, নিম্ন ব্যয়ের বাসস্থান এবং জন পরিবহণ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রেও সরকার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের কার্যকরী সহাবস্থান বিকল্প পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

সুশাসন ও দায়বদ্ধতা

যুক্ত উন্নয়নের প্রশ্নে বর্ধিত সম্পদের জোগানের পাশাপাশি যে হস্তক্ষেপ সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দাবি করে তা হল গৃহীত কর্মসূচির উন্নততর রূপায়ণ এবং বর্ধিত দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা সুশাসনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। প্রথমত কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলির কার্যকরী রূপায়ণের প্রশ্নে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদারি মানসিকতায় উন্নয়ন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ঝুঁকি বহনকারীদের (স্টেকহোল্ডার্স) সঙ্গে আলোচনার মানসিকতা, যা উন্নয়নে স্থানীয় অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করবে, দ্বিতীয়ত বহুক্ষেত্রেই রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অভাব রূপায়ণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর, জাপান, চীন কিংবা কোরিয়ার অভিজ্ঞতা নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির প্রশ্নে ভারতীয় উদ্যোগকে অনেকটাই সহায়তা করবে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দুর্নীতির মোকাবিলায় দ্রুত এবং কঠোর হস্তক্ষেপ, একাধিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটি ভারতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বহুক্ষেত্রে বিলম্বিত করে তুলেছে। দায়বদ্ধতার মতো স্বচ্ছতাও সুশাসনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

সারণি-২
সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় ভারতের অগ্রগতি

লক্ষ্যমাত্রা	বিষয়	সর্বশেষ পরিমাপের বছর	অগ্রগতির শতকরা হার লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে
(১) দারিদ্র ও ক্ষুধা	(ক) জাতীয় দারিদ্রসীমার নীচে	২০১১-১২	২১.৯
	(খ) কম ওজনের শিশু (৩ বছরের নীচে)	২০১৩-১৪	২৭
(২) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা	(ক) নিট ভর্তির অনুপাত (প্রাথমিক)	২০১৩-১৪	৮৮.০৮
	(খ) বিদ্যালয়ে টিকে থাকা (১ম-৫ম শ্রেণি)	২০১১	৯৩
	(গ) যুব সাক্ষরতা (১৫-২৪ বছর)	২০১১	৮৬
(৩) লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন	(ক) প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেদের অনুপাতে মেয়ে	২০১১-১২	১.০১
	(খ) মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেদের অনুপাতে মেয়ে	২০১১-১২	০.৯৩
	(গ) মজুরিভিত্তিক অকৃষি কাজে মহিলা	২০১১-১২	১৯.৩
(৪) শিশুমৃত্যু হ্রাস	(ক) ৫ বছরের নীচে প্রতি ১০০০ পিছু	২০১৩	৪৯
	(খ) ১ বছরের নীচে প্রতি ১০০০ পিছু	২০১৩	৪০
	(গ) টীকাকরণ (১২-২৩ মাস)	২০০৯	৭৪
(৫) মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি	(ক) মাতৃত্বজনিত মৃত্যু (প্রতি ১,০০,০০০ জন্মপিছু)	২০১১-২০১৩	১৬৭
	(খ) শিশুর জন্মসময়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি	২০০৯	৭৬.২
(৬) এইচআইডি, ম্যালেরিয়া, এইডস ইত্যাদি প্রতিরোধ	(ক) এইচআইভি-র উপস্থিতি	—	উন্নতির স্তরে
	(খ) ম্যালেরিয়া	—	উন্নতির স্তরে
	(গ) টিবি	—	উন্নতির স্তরে
(৭) সুস্থিত পরিবেশ সুনিশ্চিতকরণ	(ক) ভৌগোলিক এলাকা অনুপাতে বনাঞ্চল	—	উন্নতির স্তরে
	(খ) পানীয় জলের সুবিধাযুক্ত পরিবার	২০১১-১২	৯০.৬
	(গ) স্বাস্থ্যবিধানের সুবিধাযুক্ত পরিবার	২০১১-১২	৫৪.৬

সূত্র : India and the MDGs, 2015, www.unescap.org

সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার প্রান্তসীমায়

দারিদ্র, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, দুর্বল স্বাস্থ্য এবং বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ভারত। প্রায় দেড় দশকের অভিজ্ঞতায় এই উদ্যোগে ভারতের সাফল্য মিশ্র। কতকগুলি ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য যেমন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক তেমনি কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতে দরিদ্রদের সপক্ষে গৃহীত যুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি ভারতকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সারণি-২ থেকে এই লক্ষ্যমাত্রায় ভারতের অগ্রগতির একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

দেখা যাচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণের প্রশ্নে (লক্ষ্যমাত্রা-১) ভারত তার লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫০ শতাংশ পূর্ণ করেছে এবং ক্ষুধার নিবৃত্তির প্রশ্নেও তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নেও

(লক্ষ্যমাত্রা-৩) ভারতের অগ্রগতি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। কিন্তু তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি (লক্ষ্যমাত্রা-২) এবং ২০১৫ সালের মধ্যে যুব শিক্ষায় সকলকে যুক্ত করার প্রশ্নে ভারতকে এখনও বহু পথ যেতে হবে। একইসঙ্গে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (লক্ষ্যমাত্রা-৩), শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনা (লক্ষ্যমাত্রা-৪), মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি (লক্ষ্যমাত্রা-৫) এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যবিধান (লক্ষ্যমাত্রা-৭)-এর প্রশ্নে ভারতের অগ্রগতি যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। ফলে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য এখনও বহু পথ বাকি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান যেমন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি তেমনি কতকগুলি যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর পর তাদের সুস্থিত করে তোলার প্রশ্নে নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। অন্যদিকে লক্ষ্যমাত্রা থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী সূচকগুলির ক্ষেত্রে ভারতকে আরও বেশি পরিশ্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দারিদ্রকে কমিয়ে আনা কারণ দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩২.৯ শতাংশ) দরিদ্র মানুষ বাস করে ভারতে (রাষ্ট্রসংঘ, ২০১৪)।

যদিও প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন কিন্তু সার্বিকভাবে যে পদক্ষেপগুলি সমস্ত সূচককে একত্রে লক্ষ্যমাত্রার দিকে পরিচালিত করবে এবং শেষপর্যন্ত এগুলিকে স্থায়িত্বের দিকে নিয়ে যাবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) বৃহত্তর ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক সমৃদ্ধি,

(খ) ন্যূনতম পরিষেবা এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে অধিকতর সম্পদের জোগান,

(গ) সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য প্রাসঙ্গিক কর্মসূচিগুলির শক্তিশালী রূপরেখা নির্মাণ ও তাদের কার্যকরী রূপায়ণ,

(ঘ) সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত পরিষেবা সরবরাহের উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ এবং

(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন।

একইসঙ্গে প্রয়োজন ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতায়ন।

ভারতে ইতিমধ্যেই দ্বাদশ পরিকল্পনা তিনটি বছর অতিক্রম করেছে এবং ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন সরকার, যাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে সকলকে যুক্ত করে উন্নয়নের দিশা নির্ধারণ। একদিকে যেমন পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নীতি আয়োগ অন্যদিকে সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার জন্য একাধিক প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন এই প্রয়াসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। ফলে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি কমিয়ে এনে রাজ্যগুলিকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান একদিকে যেমন রাজ্যগুলিকে স্থানীয় সমস্যা নিজেদের মতো করে ভারতে সাহায্য করবে তেমনি এই উদ্যোগ রাজ্যগুলির কাছে তদারকির প্রশ্নে নতুন দায়িত্বের পথ প্রশস্ত করবে। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হবে দূরবর্তী এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি। আশা করা যায় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব নেতৃত্ব স্থায়ী উন্নয়নের যে রূপরেখা নির্মাণ করবেন, 'টিম ইন্ডিয়া' হিসাবে ভারত তার সম্মিলিত প্রয়াসে দ্বাদশ পরিকল্পনার সময়কালে সেই লক্ষ্যমাত্রার অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হবে।❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী নদীয়া।
email : utpal1960@gmail.com]

উল্লেখপঞ্জী :

(১) Ahluwalia, M. (2007) Business Standard, 29th June, 2007.
(২) World Bank (2002), India : Raising the Sights-Better Health Systems for India's Poor-Findings, Analysis and options, World Bank, Washington DC.
(৩) The Tendulkar Committee (2009), Report of the Expert group to review the Methodology for estimation of Poverty, Planning Commission, GOI, New Delhi.
(৪) National Rural Health Mission (NRHM) 2006, Mission document (2005-2012) Ministry of Health & F.W., GOI.
(৫) Patnaik, U. (2010) Trends in Urban Poverty under Economic Reforms : 1993-94 to 2004-05, EPW, Vol. No. 45, No. 4.
(৬) Singh N.D. (2010), Rural Health Care and indebtedness in Punjab, EPW, Vol. No. 45, No. 11.
(৭) Millenium Dev. Goals (2014) United Nations.
(৮) India and the MDGs (2015), www.unescap.org
(৯) Approach to the 12th Five Year Plan (2011), Planning Commission, GOI.
(১০) NSS 66th Round (2009-10), Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi.
(১১) World Bank (2010), Press Release No. 2010/304/SAR, 18th March, Washington DC.
(১২) United Nation Dev. Program (UNDP, 2004), Geneva.

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

সার্বিক বিকাশে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের গুরুত্ব

দেশের আর্থিক বিকাশ হলেই যে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে, এ ধারণাটা আজ পালটে গেছে। একসঙ্গে সবার বিকাশ—বর্তমানে এটা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলমন্ত্র। এই প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা খতিয়ে দেখছেন **তপন কুমার ভট্টাচার্য।** *আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানের দিকেও আলোকপাত করেছেন লেখক।*

গত ৩ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হল আদমশুমারির প্রতিবেদন। এবারের জনগণনা অন্যান্য আদমশুমারির থেকে আলাদা। আপাতত গ্রামাঞ্চলের অবস্থানটাই তুলে ধরা হয়েছে এবং শহরাঞ্চলের প্রতিবেদনটি পরে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এ ধরনের গণনা এই প্রথম। কাজটা শুরু হয়েছিল চার বছর আগে, ২০১১ সালে। এর আগে অবশ্য ইংরেজ আমলে ১৯৩১ সালে এ ধরনের একটা গণনা হয়েছিল, যদিও সে সময় পরাধীন ভারতে প্রেক্ষিতটা ছিল আলাদা। সরকার প্রতিবেদনের পুরোটা প্রকাশ করেনি। কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সামগ্রিক চিত্রটা তুলে ধরেছে এবং জাতভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থানটা আপাতত ফাইলবন্দি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আদমশুমারির প্রতিবেদন থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তাতে সকলেই হতবাক। কারণ বঞ্চনার নিরিখে গ্রামীণ পরিবারগুলির অর্ধেককেই 'গরিব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশে শহর ও গ্রাম মিলিয়ে মোট পরিবারের সংখ্যা ২৪.৯ কোটি। এর মধ্যে গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১৭.৯১ কোটি। বঞ্চনার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া বিষয়গুলির নিরিখেই এই ফলাফল এবং বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে কাঁচা বাড়ি, নিজের জমি না থাকা, কায়িক শ্রমে জীবন ধারণ করা, পরিবারে কর্মরত সাবালক পুরুষ সদস্য না থাকা প্রভৃতি।

বঞ্চনার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। এক-ঘর বিশিষ্ট কাঁচা বাড়িতে বাস করেন এমন পরিবারের সংখ্যা ২.৩৭ কোটি, ভূমিহীন পরিবার যাঁদের আয়ের বেশিটাই আসে কায়িক শ্রম থেকে তাদের সংখ্যা ৫.৩৭ কোটি, মহিলা পরিচালিত পরিবারের সংখ্যা, যে পরিবারে ১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সি কোনও পুরুষ সদস্য নেই, ৬৮.৯ লক্ষ। এ ধরনের আরও বঞ্চনা তাছাড়া দিনযাপনের ক্ষেত্রে পরিবারগুলির সংখ্যা এ রকম : কৃষিকাজে যুক্ত ৫.৩৯ কোটি এবং এরা মোট গ্রামীণ পরিবারের ৩০ শতাংশ; অ-কৃষি কাজে বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ২৯ লক্ষ, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ১.৬ শতাংশ; দিনমজুর ৯.১৬ কোটি; জঞ্জাল কুড়ানো ৪.০৮ লক্ষ; ভিক্ষাজীবী ৬.৬৮ লক্ষ। প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনও বাঁধা মাইনের কাজ নেই। সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করেন এমন পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৯.৭ শতাংশ।

শহরাঞ্চলের প্রতিবেদন সরকারিভাবে প্রকাশিত না হলেও যেসব তথ্য অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বলা যায় শহরের চাকচিক্যের আড়ালে বঞ্চনাটাও কম নয়। যেমন শহরের অন্তত ৩৫ লক্ষ পরিবারের সে রকম কোনও আয়ই নেই। ঘরে জলের সরবরাহ নেই এমন পরিবারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ, বিদ্যুৎ নেই ৬ লক্ষ পরিবারের, ভিখিরি পরিবার ১ লক্ষ, জঞ্জাল কুড়ানো পরিবার ৪০ হাজার।

তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে যে প্রতি বছর বলা হচ্ছে দেশে দারিদ্র কমছে! পরিকল্পনা কমিশনের (বর্তমানে নীতি আয়োগ) হিসাবও তো তাই বলছে। ২০০৪-০৫ সালে দেশে দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৭.২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪১.৮ শতাংশ। আর ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১.৯ শতাংশ এবং ২৫.৭ শতাংশ। তেন্ডুলকর কমিটির নির্ণীত গণনার ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান। আসলে আমাদের দেশে বঞ্চনার ক্ষেত্রগুলো এত বিশাল যে একটা দুটো মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে গেলে সঠিক তথ্যের হিসাব পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানের বঞ্চনা-ভিত্তিক এই পরিসংখ্যান সত্যের অনেকটা কাছাকাছি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

তাহলে দেশ স্বাধীন হবার এত বছর পর আর এত পরিকল্পনা-টরিকল্পনা রূপায়িত হবার পরও এই হালটাই বা কেন? কারণ প্রথম দিকে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গরিব মানুষের দিকে আলাদাভাবে দৃষ্টি না দিয়ে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছিল পরিকাঠামো নির্মাণের উপর। রাস্তাঘাট, রেল, বিদ্যুৎ, সেচ-প্রকল্প, বন্দর, প্রভৃতি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সরকারের উদ্যোগে একের পর এক কলকারখানাও গড়ে ওঠে। সরকারের নীতি ছিল সরাসরি দারিদ্র দূরীকরণের মতো কোনও কর্মসূচি নেবার প্রয়োজন নেই। কারণ দেশে সম্পদ সৃষ্টি হলে সেই সম্পদের অংশ গরিব মানুষের কাছেও পৌঁছে যাবে। মূলত অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে এই তত্ত্বকে হাতিয়ার করেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় এবং পরে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনায় এই তত্ত্বকে সামনে রেখেই এগোনো হয়।

কিন্তু বাস্তবে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতেই কুক্ষিগত হতে থাকল। এমনকী কৃষকদেরও মহাজনদের উপর নির্ভরতা কমার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। নীতি নির্ধারকরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ বিকাশের সুফল সব মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না এবং কিছু মানুষ বেশি ধনী হয়ে উঠছেন। সবার জন্য বিকাশ বা 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর ধারণাটা তখন থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করে। চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৯-'৭৪) অভিমুখও বিকাশ হার বা 'গ্রোথ রেট'-এর দিকে নির্দেশিত হলেও এই প্রথম দুর্বল শ্রেণির একটা ধারণা দেওয়া হল। বলা হল তফশিলি জাতি, উপজাতি, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর ও দুর্বল এবং এঁদের জন্য বিশেষ প্রকল্প প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে ১৯৬৬ সালে শ্রীভেঙ্কটাপ্পাইয়ার নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'অল ইন্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট রিভিউ কমিটি'। এই কমিটি কাজ করে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। কমিটি লক্ষ করে কৃষকদের

এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। কিন্তু দেশের প্রথাগত ঋণ ব্যবস্থার বাইরেই এঁদের অবস্থান। অর্থের অভাবে কৃষিক্ষেত্রে এঁরা উন্নত মানের প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারছেন না। আর তার ফলে তাঁদের আয় যেমন কমছে, সেরকম কমছে দেশের কৃষি-উৎপাদন ও জাতীয় আয়। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নের জন্য গঠন করা হল একটি পৃথক সংস্থা—'স্মল ফার্মারস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (SFDA)। একইভাবে প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিকদের জন্যও গঠন করা হল আরও একটি সংস্থা—'মার্জিনাল ফার্মারস অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল লেবারারস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (MFAL)। ১৯৬৯ সালে এই সংস্থা দুটির গঠনই ব্যাংক ঋণের সহায়তায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে SFDA এবং MFAL একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯৮১ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (DRDA)। পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে অবশ্য গরিব মানুষের জন্য বেশি বেশি প্রকল্প গ্রহণের জন্য কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনাকাররা এই প্রক্রিয়াটিকে বলেন সরাসরি দারিদ্রের উপর আঘাত হানা বা 'direct attack on poverty'।

ব্যাংক জাতীয়করণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ

যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হল সেগুলির রূপায়ণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন ব্যাংকের সহায়তা। কিন্তু সারা দেশে মানুষকে সহায়তা দিতে ব্যাংকের এত শাখাই তো নেই। তাও যেটুকুও রয়েছে সেটুকু বেসরকারি মালিকানায় দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে ন্যস্ত এবং তাঁরা লোকসান করে গরিব মানুষকে সহায়তা দিতে এগিয়ে আসবেনেই বা কেন। সুতরাং দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই দেশের ১৪টি বৃহৎ ব্যাংক জাতীয়করণ করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখনও পর্যন্ত দেশের শাসকরা সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রটিকেই ব্যবহার করে চলেছেন। এর পর অবশ্য আবার ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল আরও ছ'টি ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়।

১৯৬৯ সালে জাতীয়করণের সময় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির শাখার সংখ্যা ছিল ৮,২৬২; আমানতের পরিমাণ ছিল ৪,৬৪০ কোটি টাকা এবং দাদনের পরিমাণ ৩,৫৭২ কোটি টাকা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টা ছিল এত কম সংখ্যক শাখা দিয়ে এই বিশাল দেশের গ্রামগঞ্জে এত উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করা কীভাবে সম্ভব হবে। দেশের ছ'লক্ষ গ্রামের জন্য সে সময় গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৮৩২। সুতরাং বলা যেতে পারে গ্রামগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোনও শাখাই সে সময়ে ছিল না। আজকের প্রেক্ষিতে সেদিনের অবস্থাটা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। কারণ এখন গ্রামগঞ্জের অধিকাংশ জায়গাতেই ব্যাংকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সুতরাং জোরকদমে ব্যাংকের শাখা খোলার কাজ শুরু হল এবং দায়িত্বটা বর্তাল 'লিড ব্যাংক স্কিম'-এর সংগঠকদের উপর। ইতিমধ্যে ব্যাংক জাতীয়করণের ছ'মাসের মধ্যেই গঠন করা হয়েছে 'লিড ব্যাংক স্কিম'। ব্যাংকের শাখা স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল এবং দেখা গেল ১৯৮০ সালে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২,৪১৯ এবং গ্রামীণ এলাকায় এই শাখার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫,১০৫। তাছাড়া 'লিড ব্যাংক স্কিম'-এর পরিচালকদের উপর দায়িত্ব বর্তাল সামাজিক ব্যাংকিং-এর কাজকে দেশের সর্বত্র প্রসারিত করা।

গত শতকের সত্তরের দশকের শেষ দিকে সবচেয়ে বড় যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয় সেটি হল সমন্বিত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প (IRDP)। প্রথমে ৩০০টি ব্লকে শুরু হয় এই প্রকল্প। তার পর ২ অক্টোবর ১৯৮০ থেকে দেশের ৫,০১১টি ব্লকের সর্বত্রই প্রকল্পটিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, কৃষি-শ্রমিক, অ-কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর প্রভৃতি মানুষ যাঁরা দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছেন তাঁদের এই রেখার উপরে টেনে তোলা। তাঁদের কাছে প্রযুক্তি, সম্পদ, পরিষেবা প্রভৃতি পৌঁছে দিয়ে এই কাজটা করা হবে। বেশিরভাগ দায়িত্বটা বর্তাল ব্যাংকগুলির ওপর। তারা এই সব মানুষকে ঋণ দেবে এবং সরকার দেবে অনুদান। এই ঋণকে পুঁজি করে তাঁরা উদ্যোগ গড়ে তুলবেন, অথবা উন্নত প্রথায় চাষবাস শুরু করবেন। সে সময় একটি পাঁচ জনের পরিবারের মাসিক আয় ৩১০ টাকা বা তার কম হলে সেই পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত বলে ধরা হত।

এই বিশালকায় প্রকল্পটি ঘিরে সে সময় সারা দেশেই এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্যাংক ও সরকারি মহলে প্রকল্পটি সফল করতে প্রচণ্ড ব্যস্ততা লক্ষ করা গিয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরে চালু ছিল এই প্রকল্পটি। কিছু ত্রুটি থাকলেও প্রকল্পটি যে অর্থনীতিতে এক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।

গত শতকের সত্তরের দশক থেকেই অসংখ্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাংক-ঋণ এবং ব্যাংকের তত্ত্বাবধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ রকম কয়েকটি প্রকল্প হল আদিবাসী এলাকার এবং পাহাড় এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৭১-৭২), বিশ দফা কর্মসূচি (১৯৭৫), কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প (১৯৭৭), মরু অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৭৭-৭৮) প্রভৃতি। ১৯৮৬ সালে চালু হয় নতুন বিশ দফা কর্মসূচি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ দফা কর্মসূচি উভয়ই মূলত সামাজিক কর্মসূচি হলেও এর অনেকগুলিরই সফলতা ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

ব্যাংকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল স্বনির্ভর-গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংকের সহায়তা প্রদান। ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প। ব্যাংক-ঋণের সহায়তায় স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তুলে দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা। ২০১৩-র ডিসেম্বরের শেষে সংযুক্তিকৃত স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১,১৬,০০০। এদের দেওয়া ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬,৮৯৩ কোটি টাকা। এছাড়াও দারিদ্রসীমার নীচের মানুষদের ৪ শতাংশ সুদে ব্যাংক-ঋণ, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্প, কৃষি-ঋণের সুদে ভরতুকি, ঋণ মকুব, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান প্রকল্প (PMEGP) প্রভৃতি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একগুচ্ছ উদাহরণ।

রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

স্বাধীনতার পর থেকেই গরিব মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার একের পর এক প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। ব্যাংকগুলিও সেই সব প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ২০০৫-০৬-এ রিজার্ভ ব্যাংক লক্ষ করল এত সব প্রকল্প তৈরি হলেও দেশের মানুষের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার আগ্রহ সেভাবে বাড়েনি। দেখা গেল দেশের মোট সাবালক মানুষের ৪১ শতাংশেরই ব্যাংকে কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। আর দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার হিসেবে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ মানুষের। অথচ ব্রিটিশ ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, তাদের দেশের ৯২ থেকে ৯৪ শতাংশ মানুষেরই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে উন্নত অন্যান্য দেশগুলিতেও দেখা যায় সে সব দেশের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করছেন। সুতরাং আরও বেশি মানুষকে ব্যাংকের ছাতার তলায় আনতে রিজার্ভ ব্যাংক তাদের ২০০৫-০৬ সালে ঋণনীতির পর্যালোচনার সময় ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেয় গরিব মানুষের জন্য খুলতে হবে বেসিক ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট। এই সব অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমার বাধ্যবাধকতা থাকবে না, প্রয়োজনে টাকা না নিয়েও তাঁদের নামে এই ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে হবে। এমনকী 'কেওয়াইসি' (নো ইয়োর কাস্টমার বা গ্রাহক পরিচিতি) নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও চলবে না। এই প্রথম দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দেখা গেল 'নো ফ্রিলস' (বাহুল্যবর্জিত) অ্যাকাউন্টের ধারণা। এর পর থেকেই এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলার প্রবণতা বাড়তে থাকল, অন্য দিকে গ্রামে-গঞ্জে এবং এমনকী দেশের দূরতম অঞ্চলেও ব্যাংকের পরিষেবা পৌঁছে দেবার উপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত দ্রুত শাখা খোলাও সম্ভব নয়। সমস্যার আংশিক সমাধানে রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে ২০০৬ সালে তাদের নীতি ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এই মুহূর্তে ইট সিমেন্টের স্থায়ী ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা সম্ভব নয়, কিন্তু অসরকারি সংগঠন, স্বনির্ভরগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা—এরা ব্যাংকিং করসপনডেন্ট বা ব্যাংক-মিত্র হিসেবে দূরদূরান্তে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারবে। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে সরকারি ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ১ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি ব্যাংক-মিত্র নিযুক্ত করেছে। এই ব্যাংক-মিত্ররা টাকা জমা দেওয়া, টাকা তোলা, অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দেওয়া প্রভৃতি মৌলিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলে কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি মাইক্রো-কম্পিউটারের সাহায্যে এঁরা কাজ করেন এবং নিকটবর্তী কোনও শাখার সঙ্গে এঁরা সংযুক্ত থাকেন।

২০১০-১১ সালের বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল 'স্বাভিমান' কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দু'হাজারের বেশি বসতি রয়েছে এ রকম প্রতিটি গ্রামে ব্যাংক-মিত্রদের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ২০১২-১৩ সালের বাজেটে এই 'স্বাভিমান' কর্মসূচির পরিধিটাকে আরও বিস্তৃত করা হল। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ১ হাজারের বেশি বসতি রয়েছে এমন এলাকায় এবং ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী যে সব বসতি এলাকায় জনসংখ্যা ইতিমধ্যে দু'হাজার ছাড়িয়েছে সে সব এলাকায় স্বাভিমান কর্মসূচি চালু করা। বর্তমানে জন-ধন প্রকল্প ঘোষিত হবার পর এই কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকেই বেছে নিলেন। তাঁর স্লোগান হল 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' (অর্থাৎ সবার সঙ্গে, সবার বিকাশ)। এই বিকাশের লক্ষ্যে শহর ও গ্রামের সমস্ত মানুষকেই আর্থিক পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসাই তাঁর প্রধান কাজ বলে তিনি ঘোষণা করলেন। কারণ বর্তমান যুগে যে কোনও ব্যক্তি ব্যাংকিং পরিষেবার আওতার বাইরে থাকলে তিনি সব ধরনের সরকারি অনুদান বা সহায়তা থেকে তা বঞ্চিত হবেনই, আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও তাঁর হাতছাড়া হবে। সুতরাং সমস্ত মানুষকে ব্যাংকের ছাতার তলায় নিয়ে আসতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার দু'মাসের মধ্যে ১৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে ঘোষণা করলেন 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা' প্রকল্প। ২৮ আগস্ট, ২০১৪ থেকে প্রকল্পটি রূপায়ণের কাজ শুরু হল। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে জানালেন, দেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও কম মানুষের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবার সুযোগ রয়েছে। অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে 'কেওয়াইসি'-র নিয়মেরও সরলীকরণ করে বলা হল, আধার কার্ড থাকলে আর কোনও নথির প্রয়োজন নেই। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের দেওয়া হবে রু-পে ডেবিট কার্ড। এই কার্ডের সাহায্যে তাঁরা এটিএম থেকে টাকা তুলতেও পারবেন। গ্রাহকের প্রাপ্ত ভরতুকি, ভাতা বা পেনশনখাতে প্রাপ্ত টাকা সরাসরি এই সব অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।

এই প্রকল্পে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা রাখা রয়েছে। তাছাড়া ১৫ আগস্ট, ২০১৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত যাঁরা অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তাঁদের জন্য রয়েছে দুর্ঘটনা বিমা ছাড়াও অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকার জীবন বিমার সুযোগ। ছ'মাস ধরে সন্তোষজনকভাবে অ্যাকাউন্টটা চালাতে পারলে ওভারড্রাফট পাবারও ব্যবস্থা থাকছে। এই ওভারড্রাফটের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা। এই প্রকল্পে ১ হাজার কোটি টাকার মূলধন-সংবলিত একটি ঋণ-জামিন তহবিল গঠন করা হয়েছে। নাবার্ডের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির তহবিল থেকেই এই নতুন তহবিল গড়ার কথা বলা হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে মানুষের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫ কোটির বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই সব অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ১৫,৮০০ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে সরকারি ব্যাংকগুলিতে। এছাড়া বেসরকারি ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংকেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত দু'জনের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং এর মধ্যে একটি অ্যাকাউন্ট অবশ্যই হবে বাড়ির মহিলা সদস্যর নামে। এই সব অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে ভরতুকি, ঋণ, বিমা, পেনশন, অনুদান প্রভৃতি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

জন-ধন সুরক্ষা যোজনা

সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র হল বিমা প্রকল্প ও পেনশন প্রকল্প। পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মৃত্যু ঘটলে পরিবারটি যাতে অনিশ্চয়তার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারে সে জন্য যেমন বিমার প্রয়োজন, সে রকম বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন আর কর্মক্ষম থাকতে পারে না তখন

জীবনধারণের জন্য পেনশনের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে পেনশনের সুযোগ পেয়ে থাকেন মুষ্টিমেয় কিছু কর্মচারী। ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় থাকলেও প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষই রয়েছেন বিমার আওতার বাইরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের আম-জনতাকে এই দুটি সুরক্ষার ছাতার তলায় আনতে গত ৯ মে (২০১৫) কলকাতা থেকে সারা দেশের জন্য তিনটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন—একটি পেনশন প্রকল্প, একটি দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্প এবং অন্যটি জীবন বিমা প্রকল্প।

পেনশন প্রকল্পটির নাম 'অটল পেনশন যোজনা'। যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল তাঁদের দিকে তাকিয়েই চালু করা হয়েছে এই পেনশন প্রকল্প। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে যাঁদের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁরা সকলেই এই পেনশন প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। গ্রাহককে মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে এবং ৬০ বছর বয়স হলে তিনি পেনশন পেতে শুরু করবেন। পেনশনের পরিমাণ ন্যূনতম ১ হাজার টাকা। ২ হাজার, ৩ হাজার, ৪ হাজার ও সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পেনশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রিমিয়ামের টাকা গ্রাহকের বয়স ও পেনশনের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।

বিমা প্রকল্পের মধ্যে একটি হল 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা'। এটি একটি দুর্ঘটনা-জনিত বিমা। অর্থাৎ দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটলে অথবা অঙ্গহানি হলে পাওয়া যাবে ক্ষতিপূরণ। প্রথমে বিমাটা করা হবে এক বছরের জন্য। এর পর থেকে নবীকরণ করতে হবে প্রতি বছর। বিমার প্রিমিয়াম বছরে ১২ টাকা। যৌথ নামে অ্যাকাউন্ট থাকলে তাঁরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে বিমা করাতে পারবেন। বিমাকারীদের বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনায় বিমাকারীর মৃত্যু হলে নমিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন দু'লক্ষ টাকা। অঙ্গহানির জন্যও পাওয়া যাবে ক্ষতিপূরণ।

'প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা' সাধারণ মানুষকে বিমার সুযোগ দিতে চালু করা হয়েছে। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত যে কেউই এই বিমা প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন। বছরে প্রিমিয়াম ৩৩০ টাকা। মৃত্যু হলে নমিনি পাবেন দু'লক্ষ টাকা।

ওপরের এই তিনটি প্রকল্পেই সাধারণ শর্ত হল সকলেরই ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। তাই এ সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে যাঁদের অ্যাকাউন্ট নেই তাঁদের অ্যাকাউন্ট করে নিতে হবে। প্রকল্পে যোগদানের সময় এবং তারপরও প্রতি বছর অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রিমিয়াম এবং বিমার টাকা কেটে নেওয়া হবে। এ জন্য এই সব প্রকল্পে যোগদানের সময়ই ব্যাংক গ্রাহকের অনুমোদন নিয়ে নেবে। প্রতি বছর বা মাসে এই অনুমোদন ভিত্তিতেই অটো-ডেবিটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে। সুতরাং গ্রাহকরা যাতে অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় টাকা জমা রাখেন সে জন্য ব্যাংকের শাখাগুলিকে এবং ব্যাংক-মিত্রদের নিরন্তর প্রচার চালাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলিকে সঙ্গী করে এক দিকে যেমন নানান ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলেছে অন্য দিকে প্রতিটি গ্রামে ব্যাংকের শাখা খোলা, প্রয়োজনে ব্যাংক-মিত্র বা মোবাইল ভ্যান মারফত পরিষেবা চালু করা, বেশি সংখ্যক মানুষকে ব্যাংকের ঘেরাটোপে নিয়ে আসা এই সব কাজও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ৭,৪৫২টি গ্রামে মূলত ব্যাংক-মিত্র এবং মোবাইল ভ্যান মারফত ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ইট সিমেন্টের পাকা বাড়ির ব্যাংক-শাখাও স্থাপন করা হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গে ২৮,১৪০টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে জনসংখ্যা ২,০০০-এর কম এবং যেখানে কোনও ব্যাংকিং পরিষেবাও পৌঁছায়নি। ইতিমধ্যে সেই সব গ্রামের ১১,৬০৪-টিতে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ব্যাংকগুলিকে শাখা স্থাপনের জায়গা দেবে যাতে ব্যাংকগুলি সেখানে তাদের শাখা গড়ে তুলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, অনেক ব্যাংকই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে এ রকম ১৫০টি শাখা চালু হবার কাছাকাছি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে এ রকম মোট ৭০০টি শাখা স্থাপিত হবে বলে শ্রী মিত্র জানিয়েছেন। তাছাড়া শহরাঞ্চলেও যে সব জায়গায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছায়নি সেই সব জায়গাতেও ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বেকারদের স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অন্যতম প্রকল্প হল স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই প্রকল্পের দুটি ভাগ—আত্মমর্যাদা এবং আত্মসম্মান। যাঁরা এককভাবে উদ্যোগ গড়ে তুলবেন তাঁদের ক্ষেত্রে বলা হবে 'আত্মমর্যাদা'। এ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। আত্মসম্মান প্রকল্পের ক্ষেত্রে গড়ে তুলতে হবে যৌথ-উদ্যোগ। এই ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। ঋণ দেওয়া হবে ব্যাংক থেকে। রাজ্য সরকার অনুদান দেবে একক-উদ্যোগের জন্য সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা এবং যৌথ-উদ্যোগের জন্য সর্বাধিক ৩.৫ লক্ষ টাকা।

বেকারদের জন্য রাজ্য সরকারের আর একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প হল 'উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প'। এই প্রকল্পে সর্বাধিক ঋণের সংস্থান রয়েছে ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারি অনুদান ও 'মার্জিন মানি' বাবদ সর্বোচ্চ পরিমাণ রাখা হয়েছে ১২,৫০০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৭,৪২৭ এবং এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৩,৩৪০। ব্যাংকগুলির সি-ডি রেশিও (ক্রেডিট-ডেবিট রেশিও, অর্থাৎ আমানতের তুলনায় ঋণের অনুপাত) ৬৬ থেকে ৬৭ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অথচ সারা দেশের গড় অনুপাত ৭৬ শতাংশ। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাটা বুঝতে এই সি-ডি রেশিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ। দেখা গেছে যে রাজ্যের সি-ডি রেশিও বেশি সেই রাজ্যের জাতীয় আয়ও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রে ঋণবৃদ্ধির পরিমাণ ৮ শতাংশ। ১ এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাংকগুলি ইস্যু করেছে ১২.৩৪ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ লক্ষ)। এই সব কার্ডে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩,৯১০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকের সঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির সংযুক্তির কাজও

এগিয়ে চলেছে। ২০১৪-র ডিসেম্বর মাসে স্বনির্ভরগোষ্ঠী পিছু ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২,০০০ টাকা (লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ টাকা)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ ক্ষুদ্র উদ্যোগে কম বিনিয়োগে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় গঠন করা হয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোগের গুচ্ছ প্রকল্প। ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক অনুদান প্রকল্পও ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংক-ঋণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উপর অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার নিজস্ব সমবায় ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে। কারণ এক সময় এই সমবায় ব্যবস্থাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল। একশো বছরের বেশি সময় ধরে এরা গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করে চলেছে। দুঃখের বিষয় কিছু মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

সামাজিক প্রভাব

এই যে কোটি কোটি মানুষ ব্যাংকের ছাতার তলায় জড় হচ্ছেন, এর সামাজিক প্রভাব কিন্তু সুদূরপ্রসারী। দেশের প্রায় ২৭ কোটি গরিব মানুষের মধ্যে ২২ কোটিরই বাস গ্রামীণ এলাকায়, অর্থাৎ দেশের মোট গরিব মানুষের ৮১ শতাংশ। এর ফলে গ্রামের মানুষ ক্রমশ শহরমুখী হচ্ছেন, সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম তাঁর PURA (প্রোভাইডিং আর্বান অ্যামেনিটিস ইন রুরাল এরিয়াস বা পুরা) তত্ত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। গ্রামাঞ্চলে শহরের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে মানুষের শহরমুখী হবার প্রবণতা কম হবে। প্রথম কাজ মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা এবং আয় বাড়ানো। কারণ আয় কম হলে সঞ্চয় ব্যাহত হয়, মূলধনি সম্পদ তৈরি হয় না, ফলে অধিক আয়ের সম্ভাবনা থাকে না এবং গরিব মানুষ গরিবই থেকে যান। প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য উদ্যোগ গড়ে তুলে মানুষের স্বাবলম্বী হবার পথ প্রশস্ত করা। ড. কালাম বলেছেন প্রযুক্তিকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে, চিরাচরিত শক্তির ব্যবহার (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি) বাড়াতে হবে। মানুষের দক্ষতা বাড়াতে হবে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হল এই সব অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। উদ্যোগ গড়ে তুলতে বা চাষাবাদ করতে অর্থের প্রয়োজন। মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা কৃষকদের আত্মহননের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ চড়া সুদের ভারে মহাজনদের ঋণ আর শোধ হয় না। গ্রামের কারুশিল্পীরা তাঁদের চিরাচরিত দক্ষতা হারিয়ে দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছেন। ব্যাংক-ঋণের সহায়তায় তাঁরা নিজেদের উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারকে বা কোনও অসরকারি সংগঠনকে বিপণনের এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। আমুলের প্রতিষ্ঠাতা ড. ভার্গিস দেখিয়েছেন গরিব দুগ্ধ-বিক্রেতাদের সমবেত করে কীভাবে বিশাল মহীরুহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

এ তো গেল সামাজিক বিবর্তনের একটা দিক। এছাড়াও আরও অসংখ্য দিক রয়েছে যেখানে মানুষ একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে সম্বল করে ধীরে ধীরে এত দিনের অচেনা একটা জগতে প্রবেশ করতে পারে। মহাজনের সঙ্গে লেনদেন করতে অভ্যস্ত মানুষজন ব্যাংকের পেশাদার লোকজনের সংস্পর্শে এলে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বাড়বে, বাড়বে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। ফলে নিজেদের উদ্যোগ গড়ার সাহস তাঁরা অর্জন করতে পারবেন। স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে নিজেদের আর্থিক আয় বাড়ানো যায়। এর ফলে মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটছে, তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, পরিবারেও তাঁদের সম্মান বাড়ছে, ছেলেমেয়েরা আরও ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে পারছে।

তৃণমূলস্তরে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে গরিব মানুষের দারিদ্র-মুক্তি যে সম্ভব তা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছেন বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, নোবেল পুরস্কার-জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনুস। আমাদের দেশেও এ ব্যাপারে হাতে-কলমে কাজ করে দেখিয়েছেন সেওয়া ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী ইলা ভাট। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' এই দর্শনকে রূপায়িত করতে ও সামাজিক বিবর্তন ঘটাতে সেই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেই বেছে নিয়েছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাংকের 'ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশন' সংক্রান্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, "আমি এখানে এসেছি দেশের গরিব মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, প্রান্তিক মানুষ এবং উপজাতি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে; আমি তাদেরই এক জন; আমি তাঁদের পক্ষেই বলতে এসেছি এবং বিশ্বাস করি আপনারা আমাকে নিরাশ করবেন না।"

এই সভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের মধ্যে যে কতটা শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তার প্রমাণ জন-ধন যোজনা এবং গ্যাসের ভরতুকির প্রত্যক্ষ হস্তান্তর প্রক্রিয়া। কারণ এই দুটি কাজই দেশের ব্যাংকগুলি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পেরেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে তিনি অভ্যাসে পরিণত করার কথা বলেন। তিনি ব্যাংকগুলিকে বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভর-গোষ্ঠীগুলির সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে বেকারদের ঋণ দিয়ে তাদেরও স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি মুদ্রা (মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট রিফাইন্যান্স এজেন্সি) ব্যাংক স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেন। কৃষকদের আত্মহনন ঠেকাতে তিনি ব্যাংক কর্মীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নতুন কোনও পন্থা উদ্ভাবন করতে বলেন। তবে এ কাজে ব্যাংকগুলি কতটা সফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ কোনও ব্যাংকেই 'আর অ্যান্ড ডি' সংক্রান্ত কোনও বিভাগ নেই এবং কর্মচারীদের এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও উৎসাহও দেওয়া হয় না।

ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করেছে। যেমন, যে সব গ্রামের জনসংখ্যা দু'হাজারের কম সেখানে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেবার সময়সীমা মার্চ ২০১৬ থেকে আগস্ট ২০১৫-য় এগিয়ে আনা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ব্যাংকগুলিতে ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ বেসিক সেভিংস অ্যান্ড ব্যাংকি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ওভারড্রাফটের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৬৬ লক্ষ অ্যাকাউন্টে। সুতরাং বলা যেতে পারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা সফল করতে ব্যাংকগুলিকে আরও অনেক অনেক গরিব মানুষকে ওভারড্রাফটের সুবিধা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে।❑

[লেখক প্রাক্তন ব্যাংক আধিকারিক।]

তিনটি যোজনা, একই লক্ষ্য—সামাজিক সুরক্ষা

সম্প্রতি দরিদ্র দেশবাসীর আর্থিক সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে আছে দুটি বিমা ও একটি পেনশন প্রকল্প। বেশ কয়েকটি সুবিধাযুক্ত এই প্রকল্পগুলির সাফল্য সামাজিক তথা আর্থিক সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিকাঠামোগত অসুবিধাও রয়েছে। এই সমস্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। লিখছেন **জিতেন্দর সিং।**

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে চালু রয়েছে অনেকগুলি বিমা প্রকল্প। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই প্রকল্পগুলি বেশিরভাগ দেশবাসীরই নাগালের বাইরে। হয়তো তাই, ভারতের এই বিপুল জনসংখ্যার সিংহভাগই এই ব্যাপারে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। এমনই এক আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সূচনা করলেন দু'টি বিমা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY) এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY)। এরই সঙ্গে তিনি চালু করলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির নামাঙ্কিত, অটল পেনশন যোজনা (APY)। দেশের সাধারণ বয়স্ক নাগরিকদের কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই এই অটল পেনশন যোজনা। বলাই বাহুল্য যে এতদিন দেশের অধিকাংশ বয়স্ক নাগরিকই ছিলেন কোনওরকম পেনশন পরিষেবার আওতার বাইরে।

প্রধানমন্ত্রীর জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা কিনলে, ক্রেতা বা ক্রেতা মনোনীত কোনও ব্যক্তি, যথাক্রমে ক্রেতা প্রতিবন্ধী হয়ে গেলে বা তাঁর মৃত্যু হলে পাবেন দুই লাখ টাকা। এর জন্য অবশ্য বার্ষিক ৩৩০ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার ক্রেতা দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে পাবেন দুই লাখ টাকাই, তবে এর জন্য বার্ষিক চাঁদা দিতে হবে মাত্র ১২ টাকা। প্রকল্পগুলি কেনার পর প্রথম বছর ধরা হবে ১ জুন, ২০১৫ থেকে ৩১ মে, ২০১৬। তারপর ফি বছর, নির্দিষ্ট চাঁদার বিনিময়ে, বিমার পুনর্নবীকরণ সম্ভব হবে। বিমা কেনার ঝামেলাও তেমন কিছু নেই। কেবল এক পাতার একটি দরখাস্ত ভরে দস্তখত করে দিলেই তা কেনা যাবে। বার্ষিক চাঁদা জমা দেওয়ার ব্যাপারেও ক্রেতা বা গ্রাহককে বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে না। শুধু একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললেই চলবে, বছর বছর বিমা প্রকল্পমাফিক চাঁদার পরিমাণ সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই কেটে নেওয়া হবে।

দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য সমাজ সুরক্ষার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে এমন প্রকল্পগুলি এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই প্রকল্পগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করে নেওয়া যাক।

এ কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নির্ধারিত বয়ঃসীমা ইত্যাদির মতো কয়েকটা কারণ হয়তো প্রকল্পগুলির জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পথে প্রথমদিকে সামান্য বাধা সৃষ্টি করবে। তবে বাস্তবে প্রকল্পগুলিকে সফল ও কার্যকর করে তোলার জন্য এমন দুই একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয়ত, বিমা কেনার ও বজায় রাখার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে বিমা কেনার বা সঞ্চয়ের একটা প্রবৃত্তি জন্মাবে। ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ সংগঠনের সঙ্গে নিয়মিত লেনদেন ও যাতায়াতেরও অভ্যাস গড়ে উঠবে। অতএব এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে অনেক মানুষ চলে আসবেন ব্যাংক পরিষেবার আওতায়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পালে লাগবে এক নতুন হাওয়া।

এ ব্যাপারে ব্যাংক পরিষেবা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্পগুলির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সেটাই। এক্ষেত্রে ক্রেতাদের বিমা কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি কোনওরকম লেনদেনে যেতে হচ্ছে না। লেনদেন যা হচ্ছে তা সবই ব্যাংকের মাধ্যমে। বার্ষিক চাঁদা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত বিকলাঙ্গতার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া, সব ব্যাপারেই গ্রাহককে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে কেবল ব্যাংকের সঙ্গে। বিমা কোম্পানির সঙ্গে এ ব্যাপারে যাবতীয় বোঝাপড়া তা সেরে ফেলেছে ব্যাংক। বিমার প্রতিশ্রুত রাশিও সরাসরি জমা পড়ছে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, জন ধন যোজনায় বিজনেস করেসপন্ডেন্ট মডেলের ব্যবহার। এমন মডেলের ব্যবহার পরোক্ষভাবে ব্যাংকের উপভোক্তা সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। যোগ্যতা থাকলে যে কোনও রোজগারহীন যুবক বা যুবতী বিজনেস করেসপন্ডেন্ট পদে যোগ দিতে পারেন। ব্যাংক থেকে বহু দূরে কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে বসেই, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই করেসপন্ডেন্টরা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন, বিমা বা পেনশন যোজনায় নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির কাজও সারতে পারবেন। এমন এক মডেলের ব্যবহারে, প্রকল্পগুলির কাজ চালানোয় ব্যাংকের খরচ কমিয়েও আনতে সাহায্য করে অনেকটাই।

পঞ্চম বা শেষ বৈশিষ্ট্যটি দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির নিরিখে বুঝতে হবে। পেনশন বা বিমার প্রকল্পগুলিতে জমা পড়ার অর্থ দেশের নানা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সোনা বা জমি বন্ধক রেখে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করার যে চিরাচরিত রীতি সে ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা কিন্তু নেই। তাছাড়া বন্ধক রাখার মতো সোনা বা জমি দেশের খুব অল্প সংখ্যক মানুষের কাছেই থাকে। তাই এই চিরাচরিত রীতি অবলম্বন করার ক্ষমতাও দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই নেই।

এই ধরনের নানা বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রকল্পগুলি এর মধ্যেই যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা তথা জমা পড়া প্রিমিয়াম-এর হিসেবের অভূতপূর্ব ভিত্তিতেই নিশ্চিতভাবে তা বলা যায়। প্রকল্পগুলির সূচনা হওয়ার পর, ২৭ জুন ২০১৫ অবধি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটি প্রকল্পে গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ১০.৪২ কোটি। তবে, তার মানে কিন্তু এই নয় যে দেশের মোট ১০.৪২ কোটি মানুষ এর মধ্যেই এই প্রকল্পগুলির সুবিধা ভোগ করছেন। আসলে একজনই কখনও কখনও একই সঙ্গে দুই বা তিনটি প্রকল্পের গ্রাহক হয়েছেন। তাই, আদতে, প্রকল্পগুলিতে নাম লেখানো দেশবাসীর সংখ্যা কিন্তু গ্রাহক সংখ্যার থেকে অনেক কম।

দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাহকেরা মূলত টাকা জমা করেছেন সরকারি বা স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে। জমা হওয়া টাকার প্রায় ৭৮ শতাংশই সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এবং বাদবাকি ১৬ শতাংশ টাকা জমা পড়েছে স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংক ও বিভিন্ন নগর এবং গ্রামীণ সমবায়িকার মাধ্যমে।

দুটি বিমার ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে ২ লাখ টাকা। তাই, সুরক্ষা বিমার চাঁদার হার মাত্র ১২ টাকা হওয়ার জন্যই হোক বা সম্ভাব্য গ্রাহকের ধার্য বয়স ১৮ থেকে ৭০ বছর বলেই হোক, দেখা যাচ্ছে যে জনপ্রিয় হয়েছে এই বিমাটিই। উল্লেখ্য যে জীবন বিমাটির বার্ষিক চাঁদা কিন্তু সুরক্ষা বিমার তুলনায় অনেকটাই বেশি, ৩৩০ টাকা। এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমাও আবার অনেকটা কম, ৫০ বছর।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ এখনও বাস করেন গ্রামে। শুধু তাই নয়, দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৭৮ শতাংশের বাসও গ্রামেই। কিন্তু প্রকল্পগুলির গ্রাহকের কেবল এক-তৃতীয়াংশই গ্রামের বাসিন্দা। অর্থাৎ, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের এই বিপুল জনসংখ্যার সিংহভাগের ওপরই প্রকল্পগুলি এখনও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। গ্রামের মানুষের কাছে ব্যাংক পরিষেবা তেমনভাবে পৌঁছতে না পারাই হয়তো এর মূল কারণ। আবার এও লক্ষ্যণীয় যে মোট গ্রাহকদের কেবল এক-চতুর্থাংশই মহিলা। এই এক চতুর্থাংশের মধ্যে কিন্তু প্রায় সমান সংখ্যায় আছেন শহর ও গ্রামের মহিলারা। এর মধ্যেই মোট ২৮ জন জীবন বিমা থেকে প্রতিশ্রুত রাশি পেয়েছেন আর সুরক্ষা বিমা থেকে পেয়েছেন মোট ৮ জন।

প্রকল্পগুলির নানা বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে পুরোটা বলা হয় না। সরকার, ব্যাংক এবং দেশবাসীর সামনে প্রকল্পগুলি যে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ রেখেছে আলোচনার দরকার সেগুলি নিয়েও।

● গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে প্রথমে প্রকল্পগুলি বোধগম্য হওয়া দরকার। তারপর দরকার এই সম্বন্ধে সচেতনতা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ ব্যাপারে যাবতীয় সঠিক তথ্য গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো সুগঠিত একটি প্রতিষ্ঠানকেও এই ব্যাপারে শামিল করা দরকার, তা না হলে কিন্তু সচেতনতার কাজ আরও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

● যে কোনও ব্যাংকের পক্ষে জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট (জন ধন যোজনার পক্ষে যা প্রযোজ্য) চালানো বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। জীবন জ্যোতি ও সুরক্ষা বিমা যোজনায় কিছু টাকা জমা পড়লে ব্যাংকের এই অ্যাকাউন্টগুলির পরিচালন ব্যয় কিছুটা লাঘব হয়।

● সামান্য টাকা জমা পড়ে যে অ্যাকাউন্টে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন নতুন কর্মী ব্যাংকের পক্ষে নিয়োগ করা সম্ভব নয়, তেমনই আবার বর্তমান কর্মীদের এই কাজে লাগালে ব্যাংকের অন্যান্য কাজ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

● কোনও বিজনেস করেসপন্ডেন্ট রাখা আদৌ হবে কি না তা একান্তভাবে নির্ভর করে ব্যাংকের কটি অ্যাকাউন্ট এই প্রকল্পগুলির জন্য খোলা হয়েছে তার ওপরে। সামান্য কিছু অ্যাকাউন্ট চালানোর জন্য বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নিয়োগও সম্ভব নয়। তাছাড়া এমন অ্যাকাউন্টে জমা পড়া সামান্য রাশির ওপরে নির্ভর করে কোনও ব্যাংকের পক্ষে লাভের মুখ দেখাও বেশ কঠিন।

● এখনও আমাদের দেশের অনেক গ্রামেই বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেটের কোনওটাই নেই। একজন বিজনেস করেসপন্ডেন্টের পক্ষে প্রত্যন্ত গ্রামে বসে কাজ করবার জন্য এই দুটি আবশ্যিক তো বটেই, তারই সঙ্গে দরকার হয় একটা ল্যাপটপ। ইনভার্টার-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বা ল্যাপটপের জন্য বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নিজে থেকে কিছু টাকা বিনিয়োগ করলেও করতে পারেন। কিন্তু তার পক্ষে কোনও বিনিয়োগেই ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বিজনেস করেসপন্ডেন্ট মডেলের সাফল্যের পথে এ এক বড় বাধা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, জীবন বিমা, সুরক্ষা বিমা এবং পেনশনের এই তিনটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে মূলত দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের কথা ভেবেই। দরিদ্র মানুষদের জন্য স্থায়ী এবং সুদৃঢ় এক সমাজ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার ব্যাপারে এ এক বিরাট পদক্ষেপ। এ পর্যন্ত যে হারে অর্থ এই প্রকল্পগুলিতে জমা পড়েছে তা আশাব্যঞ্জকও বটে। তবে দরিদ্র নগরবাসী এবং পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে এই সাফল্য। প্রাথমিক পর্যায় অনুমান করা যায় যে গ্রামাঞ্চলে অপ্রতুল ইন্টারনেট ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত ব্যাংক পরিষেবা এবং সচেতনতার অভাবই এর প্রধান কারণ।

উপসংহারে বলতে হয় যে মাত্র কয়েক দিনের মাথায় প্রকল্পগুলির সাফল্য সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। প্রকল্পগুলির মাধ্যমে আর কিছু না হোক, এক নতুন পরিচালন ব্যবস্থা যেমন সৃষ্টি করা গেছে, তেমনই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ব্যবসার এক নতুন সুযোগ করে দেওয়া গেছে। কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার হল এই যে প্রকল্পগুলি দেশের দরিদ্র মানুষকে দিতে পেরেছে এক নতুন নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।❑

[লেখক ভারতীয় অর্থনৈতিক কৃত্যকের সদস্য। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের শিল্পনীতি ও শিল্পোন্নয়ন বিভাগের অধীনস্থ অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দপ্তরে উপ-নির্দেশক পদে কর্মরত।

email : singh.jitender@nic.in]

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

August, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।